এখন ডুয়ার্স

১৫-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। ১২ টাকা

ডুয়ার্স এক্সপ্রেস

উত্তরের অপেক্ষায় এখন গোটা রাজ্য

দান খয়রাতিতেই কি বাঁচবে চা-বাগান?

ডুয়ার্সের লোকদেবতাদের রাজত্বে অশনিসংকেত

উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগের কিছু টিপস

ডুয়ার্সে তিন এলিট সন্ধ্যা সাড়া জাগাল

এখন পাক্ষিক

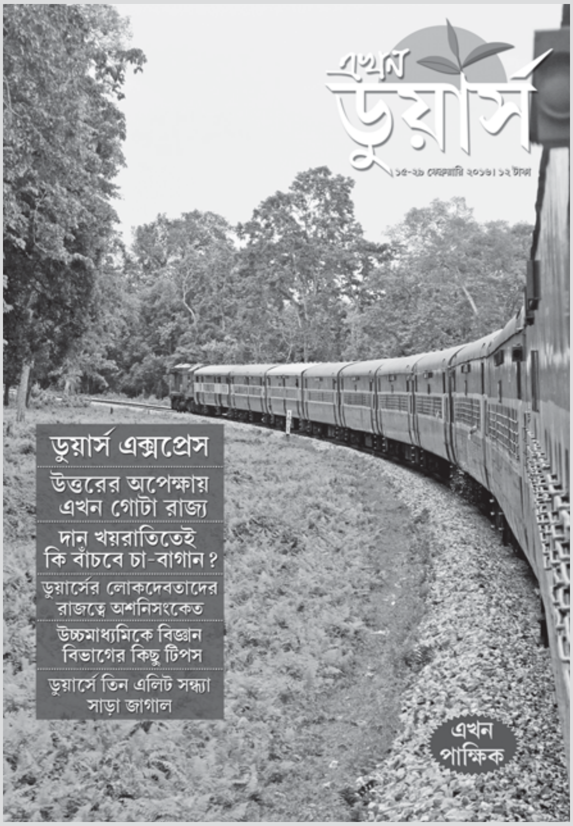

এ পথ চেনে অরণ্যকে, পথের আঁকেবাঁকে
পাতার মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেউ যেন রোজ ডাকে
কার হাতে এই নিপুণ তুলি? কী ছবি সে আঁকে?
ডুয়ার্স যেন ক্যানভাসে রোজ নিজের অঙ্গ ঢাকে!

পথ খুঁজে নেয় আরও গভীর, পথ চলে যায় দূরে
বনমাদলের অবাক নেশায় সবুজ সমুদ্দুরে
ঢেউ তুলে যায় রেলের চাকা বনের হৃদয় খুঁড়ে
জানলাতে চোখ যেই রেখেছি, সব ভেসে যায় সুরে!

আকাশ তখন হাতের মুঠোয়, সবুজ মেশে নীলে
'দোষ হবে না একটুও তোর আমায় কিছু দিলে
চোখ দুটো দে আমায় এখন, তোর বুকে যাই মিলে'
ডুয়ার্স যেন বলছে কথা অবাক অন্ত্যমিলে!

ছিটকে আসে টাটকা সবুজ, সবুজ এত গাঢ়?
একটা ইজেল তৈরি করে আঁকতে তুমি পারো
এই ঘন বন নিবিড় মানুষ পাখপাখালি, আরও...
পথটাকে সব ভালইবাসে যতই কাঁদাও, মারো।

ছন্দে অমিত কুমার দে
ছবিতে অমিতেশ চন্দ

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।
এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় বর্ষ, ১১/২ সংখ্যা, ১৫-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

এই সংখ্যায়

ডাকে ডুয়ার্স
বুড়ো গজানন বনাম নাগরিক দঙ্গল ৪
স্পেশাল ডুয়ার্স
তিন এলিট সন্ধ্যা সাড়া জাগাল ডুয়ার্সে ৮
দূরবিন
মমতাই পেরেছেন সাইকেল বিলিকে গণকর্মসূচি বানাতে ২৩
রাজনীতির ডুয়ার্স
উত্তরের অপেক্ষায় এবার গোটা রাজ্য ২১
পাহাড়ের রাজনীতিতে অন্য মাত্রা আনবে হরকা ও তাঁর নতুন দল ২২
এখন ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের লোকদেবতাদের রাজত্বে অশনিসংকেত ১২
চায়ের কাপে চোখের জল
দানখয়রাতির উপর নির্ভর করেই কি বাঁচবে চা-বাগান আর শ্রমিকরা? ১৬
দৈনিকের খবরে মন্ত্রী মর্মাহত, এত সরকারি সাহায্য তবুও... ১৯
পাঠকের ডুয়ার্স ৬
নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ১০
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ১১
সংঘ সংস্কৃতির ডুয়ার্স ২৮
বইপত্রের ডুয়ার্স ২৯
শখের শেখা ৪৪
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৬
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ২৬
সাহিত্যের ডুয়ার্স ৩৬
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ছিটমহলের ছেঁড়া-কথা ২৫
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩০
তরাই উৎরাই ৩২
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৭
বিদ্যার্থীর ডুয়ার্স
উচ্চমাধ্যমিকের বিজ্ঞান বিষয়ে জরুরি পরামর্শ ২৭
ডুয়ার্সের গল্প
উতল হাওয়ার সন্ধানে ৩৪
পর্যটনের ডুয়ার্স
বনভোজন আর ট্রেকিং-এ ডাকছে ডুয়ার্সের টেবল মাউন্টেন চেলখোলা ৪০
শ্রীমতী ডুয়ার্স
গোড়ালি ও ঠোঁটের যত্নে ঘরোয়া টিপস ৪১
শ্রীমতী বলছেন ৪১
সমাজে শ্রীমতী ৪২
মেঘপিয়োন ৪২
টেক টক ৪৩
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৫
ভাবনা বাগান ৪৭
তক্কাতক্কি ৪৭

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
বিপণন দপ্তর বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা- ৭০০০১৯, **ইমেল-** ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Duars Eco Wonders. Kolkata booking 18/7 Dover Lane, Kolkata 700 029 Phone 9903832123, 9830410808, 033-65360463

বুড়ো গজানন বনাম নাগরিক দঙ্গল

বনের চেনা ঠিকানায় ফিরেও কি সে বেঁচে আছে? আর যদি বা বেঁচেও থাকে, তবে সে ভাল নেই নিশ্চয়ই। সুস্থ থাকলে তাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। রোদ এড়াতে নিশাচর ওই প্রাণীরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, কিন্তু রাতে এক জায়গায় থাকে না। তার হাঁটাচলাতেও ছিল ঘোর আচ্ছন্নের ভাব। হাঁটাচলার ধরন দেখে বিশেষজ্ঞদের একেবারেই ভাল ঠেকেনি। এক তো নগর সভ্যতার উৎসাহের আতিশয্যে তাকে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তারপর হুলাপার্টি, তাতেও যখন বনকর্মীরা ব্যর্থ, অগত্যা ঘুমপাড়ানি গুলি। এমনিতেই যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তার উপর ১০ মিলিমিটারের জায়গায় ২৩ মিলিমিটার জাইলাজিল ডার্ট। ডোজের এ ধরনের হেরফেরে বুড়ো গজাননের হাল যে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। লোকালয়ে বন্য প্রাণী ঢুকে পড়ার বিরাম নেই। ওদিকে ঢাল-তরোয়ালবিহীন নিধিরাম সর্দার হয়ে রয়েছে বন দপ্তর। সাড়ে চার বছর হল সরকার কর্মী নিয়োগ বন্ধ রেখেছে। বন পাহারা দেবার লোকের দারুণ অভাব। তবে হাতি মরুক-বাঁচুক যা-ই ঘটুক না কেন, জঙ্গলেই সেঁধিয়ে থাকবে। তাকে ডেরায় ফেরানো গিয়েছে— এর জন্য বনকর্মীদের পুরস্কৃত করার কথাও ভাবতে শুরু করেছেন বন মন্ত্রী। শুধু পুরস্কারেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না, বুনো হাতির দাপাদাপিতে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে অনেক। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ফর্ম ফিলআপ করানো হয়েছে। কতটা কীভাবে করা যায় ভাবনাচিন্তা চলছে।

বুড়ো হোক আর বুনো হোক, তাকে নেহাত ভদ্রলোকই বলতে হবে। তা না হলে দুর্ঘটনা যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাত তা এখন না ভাবাই ভাল। কয়েকটা ঘরবাড়ি উঠোন দোকান সে ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু ওইসবই তার চলার পথের মাঝে পড়েছিল বলেই। তাড়া খেয়ে সে যাবে কোথায়? কিন্তু তার গায়ে যে কত লক্ষ ইটপাটকেল পড়েছে, তার কি কোনও হিসাব আছে? ক্ষতবিক্ষত হয়েছে চামড়া, রক্ত ঝরেছে, যন্ত্রণায় চোখ-মুখ কুঁচকেও তো সে পালটা রাস্তায় একবারের জন্যও হাঁটেনি। যদি হাঁটত, শিলিগুড়ি শহরের কপালে কী দুর্ভোগ নাচত তা কি আর বলে দিতে হবে? একটা ৬০ বয়সি হাতি, দৃষ্টিশক্তিও তার অনেক কমেছে। পথ হারিয়ে জঙ্গল থেকে নগরে ঢুকে পড়েছে বলে এমন তাণ্ডব?

ইট-কাঠ-কংক্রিটে বেড়ে ওঠা শিলিগুড়ি শহর জঙ্গল ছুঁয়েছে অনেকদিন। তার মানে এই নয় যে, জঙ্গল উধাও হয়ে গিয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর, মহানন্দার বনাঞ্চল এখনও অনেক বন্য প্রাণীর বাস ও আহারস্থল। তবে আড়ে-বহরে বাড়তে বাড়তে শিলিগুড়ি শহর যে কখন জঙ্গল গিলতে শুরু করেছে, তা হয়ত কেউই খেয়াল করেনি। কিন্তু বুড়ো গজানন লক্ষ করেছে। বৈকুণ্ঠপুরের প্রান্তিক রেঞ্জ ডাব গ্রামের শাল জঙ্গল ঘেঁষা মাঠে তাকে কেউ কেউ দেখতে পেয়েছিল। জঙ্গলের ধারে খোলা মাঠে চুপ করে সে দাঁড়িয়ে থাকত। হারিয়ে ফেলা পথ ঠাহর করার চেষ্টা করত হয়ত— এমনটা মনে করছেন বন বিভাগের কেউ কেউ। আর সেই কারণেই সে এক পা এক পা করে জঙ্গল ছেড়ে শহরের উপকণ্ঠে এগিয়ে এসেছিল। শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের পাশেই বৈকুণ্ঠপুরের সংরক্ষিত জঙ্গল। মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে বৈকুণ্ঠপুরে হাতি, চিতা বাঘের আনাগোনা রয়েছে। চা-বাগান কিংবা বনবস্তি এলাকায় হাতি, চিতা বাঘ ঢুকে পড়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটে, কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা বন্য প্রাণীকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে না। তিন দিক বা দু'দিক থেকে তাড়িয়ে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করে। তাতে কাজও হয়।

কিন্তু সে দিনের ঘটনায় হল উলটোটা। জঙ্গল ছেড়ে নগরসমাজে ঢুকে পড়তেই নাগরিক দঙ্গলের নজরে পড়ে যায় সে। ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে হাতি ঢুকে পড়েছে— এ খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে যায়। বিশালাকার গজাননের দিকে চারদিক থেকে ধেয়ে আসে সভ্য নাগরিকের দল। আচমকা মানুষের প্লাবন দেখে বুড়ো গজানন তো আশ্চর্যান্বিত। এহেন দৃশ্য সে কখনও দেখেনি। বনের কোনও বন্য প্রজাতিই হয়ত দেখেনি। বনে পিকনিক পার্টি হয়, সাফারি হয়, বন্য পশু দেখতে মানুষ ভিড় জমায়, কিন্তু জঙ্গলে ঢুকে পড়া সভ্য নাগরিকদের দেখতে কখনও জানোয়াররা ভিড় জমায় না, তাদের ঘিরেও ধরে না। সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বুড়ো গজানন জানে না উৎসাহ-উদ্দাম-উল্লাস কী জিনিস। অতএব সেই বন্য জানোয়ারের পক্ষে হতচকিত হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। পুলিশ, প্রশাসন, বন দপ্তর, দমকল, জনপ্রতিনিধি প্রত্যেকের কাছেই একে একে খবর পৌঁছে যায় যথাসময়ে। কিন্তু সমন্বয়ের অভাবে পুরো ব্যাপারটাই যায় তালগোল পাকিয়ে। এক তো বুড়ো গজানন ধেয়ে আসা মানুষের ইট আর মোবাইল দেখে ঘাবড়েঘুবড়ে একাক্কার। তার থেকেও বেশি গুলিয়ে ফেলেন বনকর্মীরা। ফলে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছেও ডেরায় ঢুকতে পারে না বুনো হাতি। বনকর্মীরা দোষ দেয় পুলিশ প্রশাসনকে, জনপ্রতিনিধি আঙুল তোলে বন বিভাগের বিরুদ্ধে— এই চাপানউতোরের শেষে ঘুমপাড়ানি গুলি। তাতেও নিষ্কৃতি আছে। কাহিল হাতির সঙ্গে নিজস্বি তুলতে ভিড় বেড়ে যায়। প্রাণপণ চেষ্টা চালায় অনেকেই।

খুব জানতে ইচ্ছে করে, ওরা কি আমাদের সঙ্গে কখনও এমনটা করে!

উন্নয়নে জলপাইগুড়ি জিলা পরিষদ

জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চলছে পরিকাঠামো উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ। প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাকা রাস্তা, সেতু, কালভার্ট, সেচ, বিদ্যালয়, গৃহ নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ চলছে। পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্বনির্ভর করানোর বস্তুনিষ্ঠ উদ্যোগ চলছে। সেই সঙ্গে চলছে সামাজিক দায়িত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধির বহুবিধ কর্মসূচি।

স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে অগ্রগতি ঘটেছেও প্রভূত, এই সব কর্মসূচির চরিত্র গণমুখী। গণমুখী চরিত্রের এই সব কর্মসূচিতে প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ।

জিলা পরিষদ সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা আন্তরিকভাবে কামনা করে।

নূরজাহান বেগম
সভাধিপতি
জলপাইগুড়ি জিলা পরিষদ

ফের আঘাত ডুয়ার্সের বন্য প্রাণে

সম্প্রতি গোরুমারা জঙ্গলের দোরগোড়ায় উদ্‌বোধন হল এক মডেল ভিলেজের। নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙা চা-বাগান ঘেঁষা ওই মডেল ভিলেজটি তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। জঙ্গল ঘেঁষা ৪০ একর জমিতে অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর গীতাঞ্জলি আবাস প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৭১ জনকে বাড়িও তৈরি করে দিয়েছে। সমাজে পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য এই উদ্যোগকে সাধুবাদ তো দিতেই হয়। কিন্তু প্রতিদিন ডুয়ার্সের প্রকৃতি-পরিবেশ যেভাবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ডুবছে, তাতে ডুয়ার্সবাসী হিসেবে বিপন্ন বোধ করছি। সাড়ে ন'কোটিরও বেশি টাকায় তৈরি এই উদ্যোগেও তাই মোটেও স্বস্তি বোধ করতে পারছি না। প্রশ্ন জাগছে, ওই ক্যাম্প থেকে গোরুমারা জঙ্গলের বামনডাঙা জিরো ক্যাম্পের দূরত্ব কত? ২৫ মিটার মাত্র। তাহলে ওই প্রকল্প তৈরির পরিকল্পনা মাথায় এল কীভাবে? প্রকল্প ভাবনা দশের মঙ্গলের হলেও তা যে পরিবেশ তথা জীববৈচিত্রে জোরালো আঘাত হানবে, সে কথা কি কোনওভাবেই প্রকল্প ভাবনায় ঠাঁই পেল না? তার থেকেও বড় প্রশ্ন, এই প্রকল্পে পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্রই বা পেল কীভাবে?

এলাকাটি গন্ডার ও হাতিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। স্বভাবতই আশঙ্কা থেকে যায় যে, ওই মডেল ভিলেজের জেরে গোরুমারা জঙ্গলের বন্য প্রাণীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। অন্য দিকে, জঙ্গল থেকে গন্ডার, হাতি ইত্যাদিরাও যে কোনও সময়ে ঢুকে পড়তে পারে ওই মডেল ভিলেজে। এমনটা ঘটে যাওয়া খুব আশ্চর্যের নয়। তার মানে বন্য প্রাণী আর মানুষের সংঘাত নিশ্চিত। আশঙ্কার তো শেষ নেই, তাই ধরেই নেওয়া যায় যে, ক্রমে চোরাশিকারিদেরও আস্তানা হয়ে উঠবে ওই মডেল ভিলেজ। তারা সেখান থেকে লুকিয়ে সহজেই গন্ডার শিকার করতে পারবে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, উদ্‌বোধন হওয়ার পরও ওই মডেল ভিলেজে এখনও পর্যন্ত জল বা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা হয়নি। প্রশাসনকে এ ধরনের আশঙ্কার কথা জানানোমাত্রই বলেছেন, বন্য প্রাণীদের জীবন যাতে বিপন্ন না হয়, সে জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কী সেই ব্যবস্থা? এর উত্তর তাঁরা দিতে পারেননি। দেওয়ার কথাও নয়। কারণ, আজ পর্যন্ত ডুয়ার্সে এ ধরনের যত প্রকল্প তৈরি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই বন্য প্রাণীর জীবন বিপন্ন করেছে। জীববৈচিত্রে আঘাত করেছে। এক কথায়, প্রকৃতি-পরিবেশকে করে তুলেছে বিপর্যস্ত। তার মানে এ ক্ষেত্রেও সেই ধ্বংসলীলা চালু থাকল।

দিলীপ রায়, বানারহাট

তিস্তা-তোর্সাও অলকনন্দা হতে পারে

তরাই-ডুয়ার্সেও হতে পারে ভয়াবহ উত্তরাখণ্ডের পুনরাবৃত্তি। এরকম আশঙ্কা যে অমূলক নয় তা পরিবেশবিদদের কথাতেই স্পষ্ট হচ্ছে। গত একশো বছরে দার্জিলিং পাহাড়ে গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় চার ডিগ্রি। পাহাড়ের যত্রতত্র মাথা তুলেছে হোটেল-বাড়িঘর। নির্মাণ যে পরিমাণে বেড়েছে, সেই তুলনায় কমেছে গাছপালার সংখ্যা। বছর বছর বেড়ে চলেছে ছোট-বড়-মাঝারি ধরনের হড়কা বান। স্বাভাবিক জলবায়ুর ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তনটা যে বিপুল তা না বললে বাস্তবিকই মিথ্যা বলা হবে। আর এই পরিস্থিতির কারণেই তিস্তা-তোর্সা-রঙ্গিত নদীর হড়কা বান অলকনন্দার মতো ভয়াবহ আকার নিতে পারে। ওই বান মিলিয়ে দিতে পারে তরাই-ডুয়ার্সের বহু জনপদ। এ ধরনের আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয় পর্যালোচনা করেই তাঁরা এই আশঙ্কা করেছিলেন। তবে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কাকে থোড়াই কেয়ার করছেন প্রশাসন। কিন্তু কেন তাঁদের এই কুছ পরোয়া নেই মনোভাব? কোন স্বার্থে?

প্রায় বছর দু'-তিন আগে এ রাজ্যের জলবায়ু বদল এবং তার প্রভাব নিয়ে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট' শীর্ষক যে রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশ করেছিল, সেখানেও কিন্তু পাহাড়ে হড়কা বানের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। ওই উদ্‌বেগ প্রকাশ করা পর্যন্ত এগিয়েই কিন্তু তাঁরা থমকে গেলেন। তারপর আজও পর্যন্ত বোঝা গেল না তাঁরা সত্যিই কতটা সে ব্যাপারে উদ্‌বিগ্ন!

তিস্তা-তোর্সা-রঙ্গিত-মহানন্দার মতো নদীগুলিতে যে হড়কা বানের সম্ভাবনা প্রবল, সে কথা পরিবেশবিদ থেকে শুরু করে পরিবেশবিজ্ঞানীরাও বারবার বলছেন। পাশাপাশি তাঁরা ওই বিপর্যয়কে আটকানোর একমাত্র উপায় হিসেবে তরাই-ডুয়ার্সে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ এবং সরকারি নজরদারির কথাও বলছেন। পরিবেশবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কার কারণ তো নিশ্চয় আছে। কী সেই কারণ?

দেখা যাচ্ছে, গত দশ বছরে প্রতি বছরই

তিস্তা-তোর্সা-রঙ্গিত-মহানন্দার মতো নদীগুলিতে যে হড়কা বানের সম্ভাবনা প্রবল, সে কথা পরিবেশবিদ থেকে শুরু করে পরিবেশবিজ্ঞানীরাও বারবার বলছেন। পাশাপাশি তাঁরা ওই বিপর্যয়কে আটকানোর একমাত্র উপায় হিসেবে তরাই-ডুয়ার্সে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ এবং সরকারি নজরদারির কথাও বলছেন।

হড়কা বানের ঘটনা ঘটেছে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির তরাই-ডুয়ার্স এলাকায়। ২০১৩ সালের জুলাই মাসে এমনই ফ্ল্যাশ ফ্লাডের ফলে ভয়ংকর চেহারা নিয়েছিল মহানন্দা। সেই বন্যায় শিলিগুড়ি মহকুমাসহ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার মানুষ। যদি আরও কয়েক দশক পিছিয়ে গিয়ে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক ইতিহাস দেখি, উঠে আসবে ১৯৬৮ সালের তরাই-ডুয়ার্সের হড়কা বান। সেই বান ও তার ফলে তরাই-ডুয়ার্সে কী ঘটেছিল, কত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কত জনপদ ভেসে গিয়েছিল— পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স যাঁদের, তাঁরা প্রায় সবাই সেই ভয়াবহ অবস্থার সাক্ষী। পরবর্তী কয়েকটা বছর হড়কা বান কিছুটা রেহাই দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে আবার ফিরে আসে ১৯৯৩ সালে। সে বছরও ভয়াবহ হড়কা বানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়। সেবার আক্ষরিক অর্থেই ভেসে গিয়েছিল আলিপুরদুয়ার।

আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির রদবদল নিয়ে খোদ রাজ্য সরকারের রিপোর্ট বলছে, যত দিন যাচ্ছে, হড়কা বানের আশঙ্কা বাড়ছে পাহাড়-তরাই ও ডুয়ার্সে। বৃষ্টিপাতের ব্যাপক তারতম্য ঘটায় ঘন ঘন হড়কা বানের ঘটনা ঘটছে এই অঞ্চলে। বিপুল জলরাশি পাহাড় থেকে ধেয়ে নামছে সমতলে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নদী অববাহিকার ফসল, সেই সঙ্গে পরিকাঠামো। পানীয় জলের আকালও দেখা দিচ্ছে।

রাজ্য সরকারের রিপোর্টেই বলা হচ্ছে, আগামী ২০২১-৫০ সালের মধ্যে পাহাড়ের গড় তাপমাত্রা বাড়বে অন্তত ২ ডিগ্রি। মোট বর্ষার দিনের সংখ্যা এ অঞ্চলে আগের থেকে কমেছে, কিন্তু বৃষ্টির প্রাবল্য বেড়েছে। এই পরিবর্তন আশঙ্কাজনক। তা ছাড়া হিমবাহগুলি গলছে, যার ফলে তিস্তা-তোর্সার মতো নদীতে বর্ষাকালে বাড়তি জল থাকে। এই অবস্থার মধ্যে যদি মেঘ ভাঙার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে তাহলে ভয়ংকর এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তরাই-ডুয়ার্সে ঘটবে বিধ্বংসী বন্যা। সেই বন্যায় মহানন্দাসহ একাধিক নদীবক্ষে গত কয়েক বছরে চরে যেসব জনবসতি তৈরি হয়েছে, নির্মাণ গড়ে উঠেছে, চাষ-আবাদ চলছে— সবই ভেসে যাবে। কিন্তু এই আশঙ্কার কোনও প্রতিক্রিয়াই আজ পর্যন্ত লক্ষ করা গেল না প্রশাসনে। তরাই-ডুয়ার্সের জনপ্রতিনিধিরাও একটি বাক্য আজ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি তরাই-ডুয়ার্সের এই ভয়ংকর পরিস্থিতি নিয়ে। কেন? তাঁরা কি এ ব্যাপারে একেবারেই ওয়াকিবহাল নন, নাকি সব জেনে-বুঝে মৌনব্রত অবলম্বন করাটাই তাঁদের রাজনৈতিক ধর্মপালনের পথ?

অর্পিতা সেন, নিউ আলিপুরদুয়ার

থিয়েটার ইউনিট সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য

আপনাদের ১৫ জানুয়ারি 'এখন ডুয়ার্স' সংখ্যায় 'চিরনবীন কোচবিহার থিয়েটার ইউনিট' প্রতিবেদনটি পড়লাম। আমি 'এখন ডুয়ার্স'-এর একজন নিয়মিত পাঠক। 'এখন ডুয়ার্স' সঠিক তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরুক— এটাই কাম্য। তাই আলোচ্য প্রতিবেদনে যে তথ্যগুলি দেওয়া উচিত ছিল এবং উল্লেখের দাবি রাখে তা আপনাকে জানাই। আমার সৌভাগ্য যে থিয়েটার ইউনিটের প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আমি সদস্য। তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, আটের দশকে যে দু'জন পরিচালক থিয়েটার ইউনিটকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁদের পরিচালনার মধ্যে দিয়ে, তাঁরা হলেন বিজয় দত্ত ও দিবাকর গাঙ্গুলি। শ্রীদত্তর সুদক্ষ পরিচালনায় 'শববাহকেরা', 'ঠিক ঠিক বাবা', 'মহামারীর চর', 'কেননা মানুষ', 'নোনাজল' এবং শ্রীগাঙ্গুলির পরিচালনায় নাটক কোচবিহার থিয়েটারের জাতকে চিনিয়েছিল। পরবর্তীতে শুভব্রত সেনগুপ্তর পরিচালনাও দলকে সমৃদ্ধ করেছে। এঁদের অবদান অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। আরও একটি বিষয় প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হয়ত তা মুদ্রণের ত্রুটি। কোচবিহার থিয়েটার ইউনিটের বর্তমান মুক্তাঙ্গন প্রযোজনাটির নাম 'কিটের খেলায় মনসামঙ্গল' (কীটের খেলায় নয়)। আশা করব এই পত্র মুদ্রিত ও প্রকাশ করে কোচবিহার থিয়েটার ইউনিটের শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভ্রান্তি দূর করবেন।

পূর্বাচল দাশগুপ্ত, নির্দেশক,
কোচবিহার থিয়েটার ইউনিট

প্রকাশিত চিঠি পাঠকের নিজস্ব অভিমত। তার জন্য 'এখন ডুয়ার্স' সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নয়।

তিন এলিট সন্ধ্যা সাড়া জাগাল ডুয়ার্সে

'এখন ডুয়ার্স'-এর উদ্যোগকে গোড়া থেকেই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জুগিয়ে আসছে এলিট শু কোম্পানি। এবার 'এখন ডুয়ার্স'-এর ব্যবস্থাপনায় ডুয়ার্সের তিন জেলার তিন শহরে অনুষ্ঠিত হল এলিট সন্ধ্যা। গত ৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ফালাকাটা কমিউনিটি হলের ভিড়ে ঠাসা প্রেক্ষাগৃহে দুর্দান্ত নাটক 'এখন তখন' পরিবেশন করল কলকাতার নাট্যগোষ্ঠী চার্বাক। কলাকুশলীদের মধ্যে ছিলেন সব্যসাচী চক্রবর্তী, অরিন্দম গাঙ্গুলি, খেয়ালি দস্তিদারের মতো জনপ্রিয় মুখ। অনবদ্য অভিনয় টানা আড়াই ঘণ্টা মাতিয়ে রাখল দর্শকদের। পরদিন ১০ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে নাটকের আগে যোগ হল ঘণ্টাখানেকের সংগীতানুষ্ঠান। তরুণতম প্রতিভা অন্তরা নন্দী পরিবেশন করলেন পুরনো দিনের বাংলা ক্লাসিক, যা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে।

ফালাকাটা, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির তিনটি সন্ধ্যাতেই অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন চার্বাক নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক অরিন্দম গাঙ্গুলি ও এলিট শু কোম্পানির কর্ণধার মৃদুল ভৌমিক। অনুষ্ঠান শেষে উচ্ছ্বসিত সাধারণ দর্শক। প্রাক্তন মন্ত্রী যোগেশ বর্মণের কথায়, বহুদিন পরে এমন দমফাটা হাসলাম। কোচবিহারের দর্শকরা বললেন একটু অন্য কথা। ডজনখানেক নাটকের গ্রুপ রয়েছে শহরে। তাদের একের পর এক নাটকের উৎসবের মাঝে এলিট সন্ধ্যা যেন মুক্ত বাতাসের মতো রয়ে গেল। তার সহজ ব্যাখ্যা করলেন জলপাইগুড়ির দর্শকরা— আসলে

আধুনিক বাংলা কবিতার মতোই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে স্থানীয় প্রোডাকশন, ফলে সাধারণ মানুষের থেকে নাটকের দূরত্ব ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। চার্বাক-এর এই প্রযোজনা তাদের কাছে নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রম।

তেমনই ডুয়ার্সের দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে চার্বাক। তাঁদের মতে, ‘এত ভাল দর্শক কল্পনাই করতে পারিনি, মনে হচ্ছিল যেন অ্যাকাডেমিতেই নাটক করছি।’ ডুয়ার্সে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে সহায়তা পুরোপুরি মিলেছে ফালাকাটার রাণার নাট্য দল ও কোচবিহার থিয়েটার ইউনিট-এর। কিন্তু ফালাকাটা কমিউনিটি হলের গ্রিনরুম, হলের রক্ষণাবেক্ষণ আরও উন্নতমানের করতে হবে বলে মনে হয়েছে। তেমনই করুণ পরিস্থিতি কোচবিহার রবীন্দ্রভবনের। যদিও জানা গেল, কিছুদিন আগেই এ বাবদ বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। আর জলপাইগুড়ির আর্ট গ্যালারি বেসরকারি হাতে যাওয়ার পর বহিরঙ্গের সাজসজ্জা বাড়লেও মঞ্চ ও গ্রিনরুম নাটক পরিবেশেনের উপযুক্ত নয়। জলপাইগুড়ির রবীন্দ্রভবন, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের প্রস্তাবিত নতুন প্রেক্ষাগৃহ যত দ্রুত তৈরি হবে, ততই মঙ্গল।

নিজস্ব প্রতিনিধি
ছবি: অমিতেশ চন্দ

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস

চোমং লামা
তুষার চট্টোপাধ্যায়
অর্ণব সেন
জীবন সরকার
দিবাকর ভট্টাচার্য
বিপুল দাস
অলোক গোস্বামী
সাগরিকা রায়
মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

পাওয়া যাবে ‘এখন ডুয়ার্স’ স্টলে দাম ২৫০ টাকা

WELCOME TO HERITAGE CITY COOCHBEHAR

HOTEL GREEN VIEW
Suit AC, Super Delux, AC, Non AC , Conference Hall
HOTEL Green View
Food & Lodging
Badurbagan Chowpathi, Coochbehar, Contact (03582) 224815/ 229081 (O), 9434756733 (M)

স্প্রিং ইন ডুয়ার্স

জব্বর গেল গত পক্ষের শেষটা। ভি-ডে আর সরস্বতী পুজোর যুগলবন্দির কারণে ডুয়ার্স জুড়ে বাকি বঙ্গের মতোই প্রেমমূর্ছনা আর বনে বনে ব্যাকুল পর্যটকের আকুল আগমন, সঙ্গে প্রাণীকুলের টেনশন। ডুয়ার্সে হরেক জনজাতির সবাই সরস্বতীর প্রতি আগ্রহী না হলেও ভি-ডে'র প্রতি বিপুল পরিমাণে অ্যাডিক্টেড। প্রেমভরা কার্ড কেবল

ডুয়ার্সের শহরে নয়, কোনায় কোনায় বিক্রি হয়। পার্কগুলিতে ঝাঁকে ঝাঁকে দোপেয়ে কপোত-কপোতী আসে পরিযায়ী হয়ে। এই যুগলরাশির প্রতি স্থানীয় 'প্রেম ফ্রাস্ট্রেটেড' দাদাদের মাস্‌লগিরির দুটো-একটা বৃত্তান্ত নজরে এলেও মোটের উপর উৎসাহের অন্ত ছিল না ডুয়ার্সে। এর পর মাসখানেক ডুয়ার্সে রঙে রঙে বসন্ত! ডুয়ার্সে এখন স্প্রিং। আর এই এক মাস স্প্রিং-এর মতো লাফাবে ডুয়ার্সের মানুষ। আপনি এলে আপনিও লাফাবেন। এখন সময়টাই রঙের। সেই ছোঁয়া মনে লাগলে পা এমনিতেই নাচবে!

কী আসে যায়

বিশ্বের বাঘা বাঘা লোকজনকে কটাক্ষ করে রাশি রাশি পোস্ট হয় ফেসবুকে। তার মধ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী, হলিউডের মহানক্ষত্র, গুপ্তিপাড়ার বকু খাস্তগির— কে নেই! ডুয়ার্স থেকেও এইরকম বাঘাদের সমালোচনা করে মহা মহা পোস্ট নিক্ষেপ করা হলেও বাঘারা কেউ পুলিশের কাছে হালুম জানায়নি। তবুও 'বাঁশি' আর 'গান' নিয়ে নিরীহ কটাক্ষ করে মালবাজারে বেচারা যুবকের কী হয়রানি হল, তা তো স্বচক্ষেই দেখলেন গো!

কে জানি গেয়েছিলেন, 'যা খুশি ওরা বলে বলুক, ওদের কথায় কী আসে যায়?' 'আরে দোস্ত! লোগ তো কহেঙ্গে। লোগোঁ কা কাম হ্যায় কহেনা।' এতে ক্ষমতা দেখানোর কী আছে ভাই? ব্রহ্মাস্ত্র মেপে না প্রয়োগ করলে তার ধার নষ্ট হয়ে যায়া! পরশুরাম বলেছিলেন।

বাঁ কান

ডানকান বাগানের সাত সাতখানা চা-বাগান সরকার অধিগ্রহণ করছে— এ সংবাদ বাসি হলেও একটা খিটকেল খটকা দেখা যাচ্ছে। ডানকানের অষ্টম গর্ভেও নাকি একখানা সন্তান আছে! এ যেন সাত ভাইয়ের এক অজানা চম্পা! কিন্তু ডানকানবাবুদের সেই অষ্টম সন্তানের আবার সরকারের খাতায় কোনও রেকর্ড নেই। আদিবাসীদের জমি হজম করে নাকি তলায় তলায় আট নম্বরটিকে চালাচ্ছিলেন বাবুরা। মাদারিহাট এলাকায় এই বাগানটিকে রসিকজনের বলে থাকেন 'ডানকানের বাঁ কান'। কিন্তু সরকারের তালিকায় যখন নেই, তখন অধিগ্রহণও নেই। ফলে, কলির অষ্টম গর্ভে জন্মে সে বেচারা পড়েছে অথই জলে!

এবার কথা হল, আদিবাসীদের জমি দখল করে বানানো বাগানখানা আর্থিক সুনীতি বা দুর্নীতি— সেইটে একবার বুঝিয়ে দিলে ভাল হয়।

কে

কং-বাম জোট হলে তাদের প্রজেক্টেড মুখ্যমন্ত্রী কে? সূর্যকান্ত মিশ্র না অধীর চৌধুরী? প্রথমজন হলে ব্যথা প্রবল। কারণ ডুয়ার্সবাসী জোট চাইলেও বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী শুনলেই ভিরমি খাচ্ছেন। দিল্লি-কলকাতা-কেরালার নেতারা কী করবেন জানা নেই, কিন্তু বামপন্থীর বদলে ডানপন্থী মুখ্যমন্ত্রীই বেশি পছন্দ ডুয়ার্সের।

জোটাবেগমত্ত নেতারা কি শুনছেন?

দেব বদল?

এই মুহূর্তে ডুয়ার্সের সেরা রাজনৈতিক গুজব এই যে, 'মিঠুদা', মানে ডি পি রায় তৃণমূলে যাচ্ছেন। এই তো কয়েকদিন আগে তাঁর জন্মদিনে দিদিভাই শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন— সে খবর মিডিয়ায় কে না দেখেছেন! আলিপুরের কংগ্রেস সভাপতি বিশুবাবু নাকি বলেই দিয়েছেন যে, নির্বাচনে আলিপুরাসনে ডি পি রায় নট অ্যালাউড। ডুয়ার্সের কোনায় কোনায় দু'জন তৃণমূল এক হলেই এ কথা-সে কথার পর চলে আসছেন এই ব্যাপারে। বামেদের সঙ্গে জোট করার আবহাওয়ায় দেবপ্রসাদের দলবদলে ঘাসফুল যে উল্লসিত হবেই— এ নিয়ে অবশ্য দ্বিমত আছে। কিন্তু সত্যিই কি দল বদলাচ্ছেন ডি পি রায়? একদল নিশ্চিত যে বদলাচ্ছেন। আরেক দলের মতে, বামেদের সঙ্গে জোট চাইছেন না বলেই যে দল পালটাবেন— এটা ভাবার দরকার নেই। মিঠুদা কি কোথাও বলেছেন কংগ্রেস ছাড়বেন? কংগ্রেসের নেতাদের মতপার্থক্য চাপা রাখা হয় না। জোটের আবহাওয়ায় দল বেঁধে বামপন্থীদের ভক্ত হয়ে যাওয়া আর বাম-দলে যোগ দেওয়া কি এক? প্রশ্নগুলো কঠিন। উত্তরও অজানা।

টুকলি ডুয়ার্স

মাধ্যমিক পরীক্ষা এলেই নকল সাপ্লাই-এর অপূর্ব কাহিনিতে এখন ডুয়ার্সও কম যাচ্ছে না। টুকলি করার আধুনিক কলাকৌশল হরেক বিধি নিয়ম জারি করে আটকানোর চেষ্টা করার অবশ্য ত্রুটি নেই; কিন্তু কাগজে চোথা লিখে জানালা দিয়ে পোস্ট করে দেওয়ার আদি কৌশল আটকাতে যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ফেল! এদ্দিন বন্ধুরা এসব দায়িত্ব পালন করলেও কয়েক বছর ধরে ডুয়ার্সের অভিভাবকদের কেউ কেউ কোমর

বেঁধে এই কাজে নেমে পড়েছেন। আসলে টিভিতে কাগজে ফি-বছর মাধ্যমিকের কালে এই দৃশ্য আর সংবাদ জানার পর তাঁরা কেনই বা পিছিয়ে থাকবেন? ফলে এবারেও মাধ্যমিকের দিনগুলিতে টুকলি সাপ্লাই-এর নয়নাভিরাম চিত্রাবলি নজরে এসেছে ডুয়ার্সবাসীর। বাপের তুলনায় মায়েদেরই বোধহয় বেশি প্রতিভা দেখা গিয়েছে এ ব্যাপারে। ট্র্যাডিশন অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে নির্ঘাত কেউ লিখবেন— 'উনিশটি বার টুকলি ভেজে/ঘায়েল হয়ে থামল হেজে!'

রূপকথা অ-রূপকথা...

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

গমখেতে ঝাঁক বেঁধে পাখিরা নামে। কেবল ছোট ছোট চারা গজাচ্ছে। ভোরবেলা থেকে পাহারা। নইলে সব সাবাড় হবে। কাকতাড়ুয়ার গায়ে রশি বাঁধা। দূর থেকে টান মারলে সে নড়ে উঠবে। গোল হাঁড়ি উপুড় করে যে দিন বিকট মাথা আঁকা হল, অবাক তাকিয়ে থাকা। খড় দিয়ে মোটাসোটা শরীর, বাবার ফেলনা ধুতিপাঞ্জাবি পরাতেই অন্য অবয়ব। মাথা বসতেই সে কাকতাড়ুয়া যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে তো দেখছেই। যে দিন গমখেতে তাকে দাঁড় করানো হল, গোটা সময় সে তাকিয়েই থাকল। খেয়াল থাকল না কী শীত পড়েছে।

তারপর প্রতিদিন কুয়াশার ভিতর থেকে সে কাকতাড়ুয়া অগাধ রহস্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছেলেটি বলল, আমি দড়ি টানব। পাখির ঝাঁক আসতেই সে দড়িতে টান দেয়, আর পাখিরা কোরাস আওয়াজ করে ছুট!

ছোট বোয়ালমারি গ্রামে সে গমখেতগুলি এখনও আছে কি? পড়ন্তবেলায় সে ভাবে, ভাবতেই থাকে। যেন এক রূপকথা। দুলাল বলল, চল, এক জায়গায় নিয়ে যাব। দেখবি একটা জিনিস আছে।

—কী জিনিস!

—খেতে দারুণ। পাসুন বা খুরপি নিতে হবে। মাটি খুঁড়তে হবে।

আলপথ এত সুন্দর হয়? ছুটতে গিয়ে অবাক হয়ে যাওয়া। পা ভিজে যায় শিশিরে। এত প্রজাপতি, এত ফড়িং!

রজনিগন্ধা ফুলের মতো গাছ, দুলাল চিনিয়ে দেয়। সে এক বিরাট প্রান্তর। জল এখন শুকনো। তবে কোথাও কোথাও অল্প জল আছে। আর তার পাশে ঝাঁক ঝাঁক বক। দুলালই চিনিয়ে দেয়, ওটা ডাহুক। ওই যে বড় বকের মতো, ওটা হাড়গিলা। (এখন আর উত্তরের এইসব গ্রামে হাড়গিলা পাখি দেখা যায় না।)

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে অনেক নিচে চলে যায় হাত। তারপর পাওয়া গেল সেটি। ছোট্ট কালো। দুলাল বলল, ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। জল কই! তাহলে প্যান্টে মুছে নে। এবার কামড়ে খা।

সত্যিই তো, কী দারুণ খেতে! দুলাল ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, একে কেশর বলে।

আজ ভাবি, ওই দিনগুলো কি সত্যি সত্যিই ছিল! ওই কেশর? কে জানে।

উকিলবুড়ো হুঁকোয় টান দিতে দিতে বলেছিল মাশান ঠাকুরের গল্প। সত্যি গল্প। তাঁকে অমান্যি করলে তিনি কী কী করেন। ছোট বোয়ালমারি গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার গেলেই মাশানপাট। বোয়ালমারিতে এক শুনশান মাঠে ছোট্ট মাশান মন্দির। পাশে লম্বা শিমুল গাছ। তার গায়ে কত কুঠুরি। সেখানে টিয়ে পাখিরা ডিমে তা দেয়। ইচ্ছে করলেও এগনোর সাহস ছিল না। মাশানদেবতার চেহারা দেখলেই হাড়ে কাঁপুনি দিত। যণ্ডাগন্ডা টাইপ! হঠাৎ খবর এল, আমাদের ক্লাসের সেকেন্ড বয় হামিদকে মাশান ঠাকুর ধরেছে। সে নাকি মৃতপ্রায়। কাকুর সঙ্গে তাকে দেখতে গেলাম। চোখ লাল, আবোলতাবোল আওড়াচ্ছে। হামিদ আর স্কুলে এল না। তাকে তো ওই মন্দিরের পাশ দিয়েই আসতে হত, যেতে হত।... জানি না, এখনও মাশান কাউকে ধরে কি না!

আর সেসব খড়ের গাদি! যেন রূপকথার আজব রাজ্য। বিচালি, খড়— আমরা বলতাম পোয়াল! যে আঁটি বাঁধা হত, সেগুলো সাজিয়ে কত রকমের খড়ের গাদি। আবার খোলা খড় দিয়ে গম্বুজাকৃতি খড়ের গাদি! বিচিত্র এক খড়-সাম্রাজ্য!

দুলাল বলল, একটা খেলা শেখাব চল। তার জন্য সে বেছে নিল গোপনতম খড়ের গাদিটি। কেন এত গোপনতা? সে বলল, দেখবি সব খেলার চেয়ে সুন্দর। সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।

খড়ে খড়ে আমরা আড়াল! দুলাল যে কাণ্ডটা করল, তার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা তো জানিই, আমরা পায়ে পায়ে পৌঁছে গেছি আমাদের বয়ঃসন্ধিতে। সে ইতিমধ্যে তার শরীরে এক মহা আবিষ্কার করে বসেছে। তর সইছে না অন্যদের শেখাতে। বলল, আমার মতো কর, দেখবি কী মজা!

সে মজা সে দিনই ধরা পড়ে গেল মায়ের কাছে। মা বকলেন না, মারলেন না। অবাক কাণ্ড, কাছে বসিয়ে বলতে লাগলেন, কেন এমন করতে নেই।

হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেলাম।

খড়ের গাদি শিখিয়েছিল রক-ক্লাইম্বিং! দোতলা বাড়ির সমান উঁচু সেসব গাদিতে চড়তে চড়তে নিজেদের মনে হত তেনজিং নোরগে, এডমন্ড হিলারি!

আর একদম বড় হয়ে ওঠা? তেনজিং যখন পৌঁছাল খড়ের গাদির মাথায়। সে দিন একা একা ক্লাইম্বিং অন্য রোমাঞ্চ! নিঝুম দুপুর। ঘুঘু ডাকছে। শীত যাবে যাবে বলছে, তবু যায়নি! প্যান্টের পিছনে গোঁজা বুদ্ধদেব গুহ। মা বকেন এসব বই পড়লে। তাই পরিকল্পনা, গাদির উপরে সবার দৃষ্টির আড়ালে ডুব দেব বুদ্ধদেবে। শীর্ষে পৌঁছে বিস্ময়— পাড়াতুতো এক কাকু আর আমাদের প্রিয় বান্ধবী। কিচ্ছু নেই গায়ে। কী করছে ওরা! অদ্ভুত সব আওয়াজ গলা থেকে। খড় আঁকড়ে ধরে একটু তাকাতেই কান গরম হয়ে উঠল, শরীরও। মনে হচ্ছে পড়ে যাব। অনেক কষ্টে নেমে এলাম উপর থেকে। সে দিন আর বুদ্ধদেব গুহ পড়া হল না।

মাকে সব বলতাম। কিন্তু এই কথাটি কোনও দিন বলা যায়নি।

রূপকথা খোঁজার মতোই কোচবিহারের মহকুমা শহর থেকে এক শীত-সকালে দুলালকে খুঁজতে গেলাম। ধর্লা নদীটি শুকিয়ে কত সরু হয়ে গিয়েছে। উত্তরের বাকি সব নদীর মতোই। বাইক থামিয়ে খুঁজতে লাগলাম সেই নদীচর, যেখানে আমি দুলাল নিখিল মীনা ছুট লাগাতাম। আমাদের সঙ্গে উড়তে থাকত কয়েক ডজন বক। বনবন করে মাথার উপর পাক খেত টিয়ে পাখি। সেই নদীচর কত পালটে গিয়েছে। ভীষণ অচেনা লাগল।

দুলাল নেই শুনতেই বুকটা কেমন শূন্য হয়ে গেল। আশপাশে কত খড়ের গাদি, কিছু বাচ্চা ছেলেমেয়ে সেখানে খেলছে। কিন্তু আমি বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম সেই চেনা লিচু গাছটির নিচে।

কেউ বলল না, তবু আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম কেউ বলছে— অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

পথিক বর

ডুয়ার্সের লোকদেবতাদের রাজত্বে অশনিসংকেত

১

সাধারণ হিন্দুধর্মে তিন প্রধান দেবতা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর। আম হিন্দুর কাছে ব্রহ্মার জনপ্রিয়তা অবশ্য নেই বললেই চলে, কিন্তু বাকি দু'জন আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে দাপটে রাজত্ব করছেন। ডুয়ার্স ভূখণ্ডও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে ডুয়ার্সে বিষ্ণু বোধহয় মহেশ্বরের জুনিয়র। কারণ কামাখ্যা থেকে জল্পেশ—প্রাচীন দেবস্থানগুলিতে শিবেরই একচ্ছত্র প্রভাব। কোচবিহারের রাজপরিবার বৈষ্ণবধর্মে আগ্রহী হওয়ার পর ডুয়ার্সে বিষ্ণু, বলা ভাল, তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত অবতার কৃষ্ণ জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। কোচবিহারে রাসের মেলা বিখ্যাত হয়ে ওঠে আর মদনমোহনের প্রতি ঢল নামে ভক্তির। কিন্তু শিব এর বহু আগে থেকেই ডুয়ার্সে পূজিত। হয়ত হিমালয়ের কাছাকাছি হওয়ার সুবাদেই শিবের এই আধিপত্য। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে, শিব অতি প্রাচীন দেবতা। সুদূর অতীতে যখন বৈদিক ভাবধারার কণামাত্র এসে পৌঁছায়নি এই অঞ্চলে, তখন থেকেই হয়ত জনপ্রিয় ছিলেন দেবাদিদেব!

শিবের পর ডুয়ার্সে অবশ্য মান্য ছিলেন মনসা। অরণ্যময় ডুয়ার্সে সাপেদের আনাগোনার অভাব নেই। তাই মনসাকে ভক্তি না করে উপায় কী? বাংলার মধ্যযুগে নাক-উঁচু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তাঁদের হেভিওয়েট দেবদেবীর পাশাপাশি লৌকিক আর স্থানীয় দেবতাদেরও যখন স্মরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, মনসার উত্থান তখন থেকেই বলে বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের সিদ্ধান্ত। ডুয়ার্স ও সংলগ্ন অঞ্চলে মনসার প্রতিপত্তি সেই সময় থেকেই বেড়েছিল, না তার আগে থেকেই মনসার আরাধনা এদিকে প্রচলিত ছিল, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। রাজবংশীরা তাঁদের ভাষাতেই 'বিষহরা' গেয়ে মনসার স্তুতি করেন, আবার 'মনসামঙ্গল' ধারার জনপ্রিয় কবিদের কাব্যও পাঠ করেন। বর্তমানকালে সাপ নিয়ে রকমারি সচেতনতার প্রচার ঘটানোর চেষ্টা সত্ত্বেও ডুয়ার্সে মনসার আরাধনার তেমন ভাটা পড়েনি। মধ্যযুগে উচ্চমহলে মনসার বন্দনা শুরু হলে তাঁকে শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেওয়া হয়। শিবেরই মেয়ে তিনি। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও বিষ্ণুদেব আদৌ কোনও পাত্তা পাননি।

কোচবিহার রাজপরিবারের আনুকূল্যে বৈষ্ণবধর্ম এবং তার অনুষঙ্গ হিসেবে কীর্তন গান ডুয়ার্সের রাজবংশী সমাজে শিকড় বাড়াতে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে। তা সত্ত্বেও, ডুয়ার্সের আনাচকানাচে যত কালী মন্দির আছে, বিষ্ণু কিংবা রাধাকৃষ্ণর মন্দির সে তুলনায় নগণ্য। কালীর কথায় পরে আসছি।

কিন্তু উক্ত রাশভারী বহুল পরিচিত দেবদেবীদের বাইরে ডুয়ার্সের নিজস্ব কিছু দেবদেবী ছিলেন। সীমিত ভৌগোলিক গণ্ডির বাইরে সেই দেবতারা যেতে না পারলেও স্থানীয় জনমানসে তাঁদের প্রভাব ছিল সাংঘাতিক। এঁদের কাউকে তুষ্ট করলে খরা দূর হয়ে বৃষ্টি এসে চাষবাস বাঁচিয়ে দিত। কেউ রেগে গেলে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে গেরস্তের ভবলীলা সাঙ্গ হত। কেউ আবার খুশি থাকলে সংসার থেকে পালিয়ে যেত অমঙ্গল। এই ধরনের দেবতারা পৃথিবীর সর্বত্রই বিরাজমান। শুধু স্থানভেদে তাঁদের নামগুলি আলাদা। চেহারাও।

মধ্যযুগের বাংলা মুসলিম শাসনের অধীনে চলে গেলে হতচকিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিত্যনতুন দেবতাদের পুজো করে বিপদ থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। মনসা, ধর্ম, চণ্ডী প্রমুখ দেবদেবীরা জাতে ওঠেন। তাঁদের নিয়ে কাব্য রচিত হয়। কিন্তু ডুয়ার্সে কোচবিহার আর বৈকুণ্ঠপুরের রাজারা ইংরেজ আসা অবধি কমবেশি স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন। অন্যথায় তথাকথিত কোনও 'উচ্চবর্ণের' কবি হয়ত এক-আধখানা 'মাশান মঙ্গল' রচনা করে বসতেন।

কিন্তু 'মাশান' পরিবারসহ ডুয়ার্সের লৌকিক তথা নিজস্ব দেবদেবীরাই এখন সংকটে। বহিরাগত বিষ্ণু, প্রাচীন শিব এবং অর্বাচীন কালী ও মনসা তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখা নিয়ে যতটা নিশ্চিত, লোকদেবতারা ততটাই অস্তিত্বের সংকটে। ভবিষ্যতে হয়ত অবাক করা রাধামাধবের মন্দির গড়ে উঠবে ডুয়ার্সে, হয়ত স্থাপিত হবে কালীর কোনও চোখধাঁধানো মন্দির। 'লৌটা'র মতো নবীন কোনও দেবীও হয়ত রাতারাতি

জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উপনীত হবেন। শুধু ক্রমশ মুছে যেতে থাকবে ‘হুদুমদেও’র আরাধনা। জালুয়া মাশানের অস্তিত্ব। স্থানদেবতার পুজো।

২

এই বিলুপ্তির কারণ কী?
উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন মূকাভিনেতা সব্যসাচী দত্ত। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানালেন যে, প্রতিটি লোকদেবতার আরাধনার পিছনে কোনও না কোনও বাস্তব কারণ থাকে। সেই কারণগুলি যদি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়, তবে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেবতাটিও অনাথ হয়ে পড়েন। তিস্তা নদীই যদি না থাকে, তবে তিস্তাবুড়ির পুজো টিকে থাকবে কী করে?

উদাহরণটা আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য মনে হলেও গাজলডোবায় ব্যারেজ নির্মাণের পর অবশিষ্ট তিস্তা নদীর চেহারা যা হয়েছে তা চোখে দেখা যায় না। ভবিষ্যতে নদীর চরে বৃক্ষরোপণ করে তাকে জঙ্গলে পরিণত করা হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু তিস্তা বয়ে যাবে। সাহিত্যিক দেবেশ রায় এই সম্ভাবনার কথা বহু আগেই লিখে ফেলেছেন। ফলে গাজলডোবার পর থেকে তিস্তাবুড়ির পুজো বন্ধ হয়ে গেলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তবে, তিস্তাবুড়ির পুজো লুপ্ত হওয়ার কল্পনাটা যদি কষ্টকর হয়, তবে হুদুমদেওর অবস্থাটা স্মরণ করুন। মানুষ এই সে দিন পর্যন্ত চাষবাসের ব্যাপারে সেন্ট পার্সেন্ট প্রকৃতিনির্ভর ছিল। বন্যা এবং খরা ছিল চাষের সবরকম উদ্যোগ মাটি করে দেওয়ার মতো দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বন্যার পর তবুও নতুন করে চাষ করার আশা জেগে থাকে, কিন্তু খরা বড় ভয়ংকর। তাই অনাবৃষ্টিতে ভয় বেশি। যদিও ডুয়ার্সে প্রচুর বৃষ্টি হয়, তবুও উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি আসার জন্য রাজবংশীর মেয়েরা হুদুমদেওকে খুশি রাখার আয়োজন করেন। এই পুজোর ধরন বেশ রহস্যময়, কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত হুদুমদেওকে ভুলে যাওয়ার কথা ভাবতে পারতেন না ডুয়ার্সের আদি বাসিন্দারা। কিন্তু এই ২০১৬ সালে বৃষ্টি খানিকটা কম হলেও পাম্প লাগিয়ে মাটির নীচ থেকে জল তুলতে সমস্যা কোথায়? জল আকাশ থেকে না এলে পাতাল থেকে টেনে বার করার পদ্ধতি সভ্যতার আদিকাল থেকে চালু থাকলে কি ‘হুদুমদেও’র প্রচলন হত? ভবিষ্যতে সেচব্যবস্থা সমেত কৃষিব্যবস্থার আরও উন্নতি হলে কে পাত্তা দেবে বৃষ্টি আসার দেবদেবীদের?

মাশান গোত্রের দেবতাদের ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা খাটে। মাশানরা প্রত্যেকেই আসলে অপদেবতা। রোগব্যাধির মতো অশুভ জিনিসকে কোনও অপদেবতার কাণ্ড বলে মেনে নেওয়াটা মানবগোষ্ঠীগুলির প্রাচীন অভ্যেস। এই ধরনের অপদেবতাগুলি রাজবংশী সমাজে ‘মাশান’ পরিচয়ে আবদ্ধ। মাশান গোত্রের অপদেবতাদের বৈচিত্র কিংবা বিশেষত্ব আলাদাভাবে আলোচিত হতে পারে, কিন্তু এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে ‘অপদেবতাদের কর্মকাণ্ড’গুলির নিদান পাওয়া গিয়েছে। প্যারাসিটামল খেলেই যদি জ্বর নেমে যায়, তবে অপদেবতাকে তুষ্ট করে কী লাভ?

অন্য দিকে, ভারতের আর দশটা অঞ্চলের মতো ডুয়ার্সেও শিক্ষার প্রসার বাড়ছে। নবীন প্রজন্ম অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রায় প্রতি ঘরে। এর ফলে নতুন প্রজন্মের রাজবংশীদের মধ্যে পুজোপার্বণের প্রতি আকর্ষণ ভয় বা ভক্তির কারণ তৈরি হচ্ছে না। হচ্ছে উৎসবের কারণে। তাই উৎসব হতে পারে এমন পুজোগুলির দিকেই তাঁদের আগ্রহ। সেখানে হুদুমদেও বা মাশান গোত্রের অপদেবতাদের কোনও স্থান নেই। কারণ এসব কালী পুজো কিংবা কীর্তনের আসরের মতো আকর্ষণীয় নয়। তাই জল্পেশের শ্রাবণী মেলায় যেতে এ প্রজন্মের যত উৎসাহ, তার তিলমাত্র পাওয়া যাবে না লৌকিক দেবদেবীর পুজোয়। বর্তমানে ডুয়ার্সের সেরা উৎসব হল কালী পুজো।

কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

দীনেশ রায়, লোকসংস্কৃতি গবেষক, ময়নাগুড়ি

আমার মতে বৈজ্ঞানিক ধারণা আর শিক্ষা বিস্তারের ফলে অপদেবতাদের প্রতি স্থানীয় ভূমিপুত্রদের আগ্রহ কমে আসছে। অপদেবতাদের সন্তুষ্ট করার পাশাপাশি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মানুষ অবশ্য আছেন, কিন্তু এঁদের পরের প্রজন্ম কেবল ডাক্তারের কাছে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আবার ভান্ডানী এখন জনপ্রিয় হলেও তিনিও কিন্তু আদতে ছিলেন অপদেবী। বর্তমানে তাঁর পদোন্নতি ঘটেছে। তবে ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকার রাজবংশীদের মধ্যে এখনও অপদেবতারা আসন পেতে আছেন। এরা চিকিৎসার বদলে পুজোপাটেই জোর দেয়।

অন্য দিকে, মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে রোগ উপশমের একটা ধারা কিন্তু আমি পেয়েছি এদের মধ্যে। মিউজিক থেরাপি বলতে যা বোঝায়, এটা অনেকটা তেমনই। বছর ২৫ আগে আমি এই পদ্ধতিটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, কিন্তু রেকর্ড করে রাখতে পারিনি। এই জিনিসটা হারিয়ে যাচ্ছে।

বিষহরির জনপ্রিয়তা এখনও বর্তমান। কিন্তু আগে তিন-চার দিন ধরে বিষহরার গান হত। সেটা এখন কয়েক ঘণ্টায় ঠেকেছে। ব্যাপারটা পুজোর অঙ্গ হলেও এই গানের মধ্যে লোকসংগীতের পুরনো ধারা মিশে আছে। এসবের সংরক্ষণ দরকার।

হ্যাঁ, ডুয়ার্সের অপদেবতাদের রাজত্ব আর বেশি দিন নেই— এটা বলতে পারি।

সব্যসাচী দত্ত, মূকাভিনয় শিল্পী ও লোকনাট্য চর্চাকারী

যুগ আর পরিবেশের বদল তো ঘটেছে। ধরুন, হুদুমদেওর পুজো। রমণীরা বিবস্ত্র হয়ে এই পুজোয় অংশ নেয়। তখন পুরুষদের বাইরে বার হওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন এভাবে পুজোর আয়োজন করা কি সম্ভব? দরকারও বা কী? হুদুমদেও খুশি না হলেও চাষবাস চালিয়ে যেতে অসুবিধা নেই। ‘গভীরা’, ‘চণ্ডীনাচ’— এসবে আর নবীন প্রজন্মের আগ্রহ নেই, কারণ ওইসব রীতি তাদের কাছে পিছিয়ে পড়া জাতির পরিচয়। যে পূজার অঙ্গ হিসেবে এসব হত, সে পুজোগুলিও ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছে রাজবংশীদের কাছেই।

তা ছাড়া ডুয়ার্সে বিদ্যুতায়নের পর এখন আর অন্ধকার নেই। তাই অনেক ভয়ও দূর হয়ে যাচ্ছে। ফলে অপদেবতারাও হয়ে যাচ্ছেন অপ্রাসঙ্গিক। অবশ্য এসব আমার ব্যক্তিগত অভিমত। বিতর্ক হতেই পারে। বিতর্ক আর আলোচনা হলে প্রকৃত কারণ বেরিয়ে আসবে। ‘এখন ডুয়ার্স’ বেশ ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় তুলে ধরছে। এ নিয়ে আরও লেখালেখির দরকার।

বর্তমান ডুয়ার্সে প্রচুর অরাজবংশী হিন্দু বসবাস করেন। কিন্তু তাঁরা আবার রাজবংশী লোকদেবতাদের পুজো করেন না। কালী, শিব, বিষ্ণুর প্রতি অবশ্য এঁদের আগ্রহ আছে। তাই আপাতত ডুয়ার্সে এই তিন দেবতার আসন লোকসভায় অটুটই থাকছে। শারদীয় একাদশীর দিন দুর্গা পুজোর বিকল্প হিসেবে স্থানীয় ‘ভান্ডানী’ দেবীর পুজো দিনে দিনে প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছে।

জল্পেশ-জটিলেশ্বরের মাহাত্ম্য রাজবংশী সমাজে ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা এই মুহূর্তে নেই। জল্পেশ তো ভুটান-নেপালেও জনপ্রিয়। তাই শিবের সিংহাসন টলছে না। ১৯৭১ অবধি বাংলাদেশ থেকে যত মানুষ ডুয়ার্সে এসেছেন, তার দশ গুণ বোধহয় এসেছে বামফ্রন্ট শাসনের সাড়ে তিন দশকে। এই কারণে বর্তমান ডুয়ার্সে প্রচুর পরিমাণ অরাজবংশী হিন্দু বসবাস করেন। কিন্তু এই জনতা আবার রাজবংশী লোকদেবতাদের পুজো করেন না। কালী, শিব, বিষ্ণুর প্রতি অবশ্য এঁদের আগ্রহ আছে। তাই আপাতত ডুয়ার্সে এই তিন দেবতার আসন লোকসভায় অটুটই থাকছে। শারদীয় একাদশীর দিন দুর্গা পুজোর বিকল্প হিসেবে স্থানীয় ‘ভান্ডানী’ দেবীর পুজো দিনে দিনে প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছে। সুতরাং ডুয়ার্সে তিনিও এখন নিশ্চিত।

দেবী মনসাও আপাতত টিকে যাবেন। বাংলাদেশে থাকলে ‘শনি’র প্রতি আনুগত্য থাকা বাধ্যতামূলক। তিনি সর্বত্র কলকেপ্রাপ্ত। ডুয়ার্সেও। ডুয়ার্সে ‘রাম’ কিন্তু আদৌ কলকে পান না অবাঙালিদের (বিহার, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্য বাসিন্দা) বাইরে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ রাজবংশীদের কাছে খুব একটা জরুরি গ্রন্থ নয়। মনসামঙ্গলের কবিরা ডুয়ার্সে কৃত্তিবাসকে খুব হারিয়ে দিয়েছেন।

৩

চিকিৎসাশাস্ত্রে ‘টিকা’ নামক বস্তুটি আসার পর থেকে বর্তমানে কলেরা ও বসন্ত নামক দু’টি কালান্তক রোগের আর কোনও প্রভাব- প্রতিপত্তি নেই। অ্যান্টিবায়োটিকের যুগে সংক্রমণের ভয়, কাটাছেঁড়া, জুড়ে যাওয়া মামুলি হয়ে যাচ্ছে। একদা অসুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত বহু ভয়-জাগানিয়া অনুভূতি আজ ডাক্তারের বিষয়। বাড়ির কেউ বমি করছে, থামছে না— এমন হলে ‘ওবুয়া মাশান’কে সন্তুষ্ট করার কথা এই প্রজন্মের রাজবংশীরা ভাবে না। তারা দেখে কাছাকাছি হেল্‌থ সেন্টার। গায়ে ব্যথা হলে বিষুয়া মাশানের প্রতি গদগদ ভক্তিও বা কে দেয়? এক কথায়, অপদেবতাদের বাজার গিয়েছে। ডুয়ার্সের লোকদেবতাদের মধ্যে যাঁরা ‘অপ’ গোত্রের, তাঁদের প্রতি ভয় ভাব, সমীহ প্রভৃতি ক্ষীণ হয়ে আসাটা তাই স্বাভাবিক। ‘লোকসংস্কৃতি’ও স্থির কোনও জগদ্দল বিষয় নয়। পরিবর্তনকে মানতেই হবে।

নদী আর অরণ্যে ভরা হিমালয়ের পাদদেশে থাকা ডুয়ার্সের জনমানবহীন অঞ্চলে চা-বাগান আর রেলপথ স্থাপনের কারণে যাঁরা নগদ মজুরির টানে আস্তানা গেড়েছিলেন, তাঁদের ভয়পিপাসু মনে স্থানীয় আবহাওয়া আর প্রকৃতি যে প্রভাব ফেলেছিল, তার লেশমাত্র পড়ে না এ যুগে। পুরনো গ্রামগুলিতে অতীতে রাজবংশী সমাজ যে অলৌকিকতার পরিবেশ পেতেন, বিশ্বাসের যে ভিত গড়ে উঠত, এখন তা নিজেই অতীত। এই পরিবর্তন সর্বত্র।

কিন্তু শুভ ভাবনার সঙ্গে জড়িত দেবতারা অতটা জমি হারাননি। মনসা বা বিষহরির কথা আগেই বলেছি। রাজবংশী সমাজে যে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে ‘বিষহরি’র পুজো আবশ্যিক। আর ‘গ্রামদেবতা’, যাঁকে প্রণাম করে গ্রামের লোক চাষবাস শুরু করেন, তিনিও সিংহাসনে বেশ শক্তপোক্ত হয়ে আছেন। অপদেবতারা ময়দান ছেড়ে সাইডলাইনে যেতে শুরু করলেও নতুন নতুন ‘ভাল’ দেবতা খুঁজে পেতে অবশ্য ডুয়ার্সের অসুবিধা হয়নি। হলদিবাড়ির কাছে ‘গর্তেশ্বরী’, বোদাগঞ্জে ‘ভ্রামরী’, তিস্তাপাড়ের কোনও কোনও গ্রামে অধুনা আবির্ভূতা ‘ত্রিস্রোতা কালী’— গোটা ডুয়ার্সে এমন আধুনিক দেবদেবী জনপ্রিয় হয়েছেন সম্প্রতি।

ডুয়ার্সের ভূত, পেত্তানি, মগর, পইরি, চন, দ্যাও, গোহিলী আর মাশানের দলের কাছে আজ সত্যিই অস্তিত্বের সংকট। এই অনার্য সংস্কার আর কতদিন ডুয়ার্স প্রজন্মের মনে রেখাপাত করার মতো প্রভাব রাখবে তা বলা মুশকিল। ডুয়ার্সের ভূমিপুত্ররা ছাড়াও যে বিচিত্র জনজাতি রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। এই লোকদেবতাদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে পারে যে, বহু বহু বছরের স্মৃতি ও সংস্কার হারিয়ে যাবে চিরতরে— কিন্তু সেটাও পুরোপুরি ঠিক নয়। জাতির ধর্মীয় ইতিহাসের অঙ্গ হিসেবে বেঁচে থাকবে। দখিনা দ্যাওকে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি হয়ত পঞ্চাশ বছর পরে কেউ আর জানবে না। কিন্তু আমরাও কি মনে রেখেছি সতীদাহ প্রথার পূজাপদ্ধতি? ‘দেবত্ব’র প্রতি বিশ্বাসের অভাব নেই কী ডুয়ার্সে, কী বঙ্গে। শিবের জনপ্রিয়তা কে ঠেকাচ্ছে এখানে? কীর্তনের আসর আটকাচ্ছে কে? বিষহরি গানের জন্য ভাল গিদাল খুঁজতে বাইক নিয়ে ছোটা বন্ধ হওয়ার কোনও কারণ নেই এই মুহূর্তে! দেবতা এখানে আছেন। ছিলেন। থাকবেন।

কিন্তু অপদেবতার ‘টিকা’ পেয়ে গিয়েছে ডুয়ার্স।

বৈকুণ্ঠ মল্লিক
ছবি: সব্যসাচী দত্ত

দানখয়রাতির উপর নির্ভর করেই কি বাঁচবে চা-বাগান আর শ্রমিকরা ?

সংশয় ছিল, প্রশ্নও ছিল গত ২৭ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব রজনিরঞ্জন রশ্মির জারি করা গেজেট অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ঘিরে। চা-শিল্পমহল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলের অনেকেই ডানকান গোষ্ঠীর সাতটি চা-বাগান অধিগ্রহণের খবরে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। প্রশ্নও রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। ডানকানের সাতটি চা-বাগান অধিগ্রহণের পথ থেকে পিছু হটল কেন্দ্র সরকার। চা-পর্ষদের চেয়ারম্যান সন্তোষ সারগি রাজ্যের মুখ্য সচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে চা-বাগান অধিগ্রহণ এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। অন্য দিকে ডানকান কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রের অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা উচ্চ আদালতে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর এজলাসে যে মামলা করেছিল, তার শুনানিও আপাতত পিছিয়ে গিয়েছে। কারণ, বিচারপতি কলকাতা উচ্চ আদালতে প্র্যাকটিস করাকালীন ডানকানের হয়ে মামলা লড়তেন। নীতিগত কারণেই ওই মামলাটি চলে গিয়েছে প্রধান বিচারপতির হেপাজতে।

মামলা কার এজলাসে কিংবা হেপাজতে তা জেনে বন্ধ বা অচল চা-বাগান শ্রমিকদের কী লাভ ? বিচারপতি কোন নীতিগত কারণে মামলার শুনানি থেকে বিরত হলেন তা জেনেই বা কী লাভ না মরে বেঁচে থাকা চা-শ্রমিকদের ? আর নীতির কথাই যখন উঠল, তখন অনেক প্রশ্নই যে ভিড় করছে। যখন বাজারে লাভজনক চায়ের দর পাওয়া সত্ত্বেও মালিকপক্ষ দিনের পর দিন বাগান পরিচর্যাহীন অবস্থায় ফেলে রেখে রুগ্ণ বাগানে পরিণত করে, তখন নীতির কথা ওঠে না কেন ? আবার ওই বাগান ফেলে রেখে কর্তৃপক্ষ যখন অন্যত্র গা-ঢাকা দেয়, সমগ্র চা-শিল্পকে অলাভজনক বলে আখ্যায়িত করে, হাজার হাজার শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আত্মসাৎ করে, তখন কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে মহামান্য আদালতের কোনও বিচারপতিই কোনও নীতির কথা তোলেন না কেন ? নীতির কথা তখনও শোনা যায় না, চা-বাগান থেকে যখন ঘন ঘন 'রামনাম সত্য হ্যায়' ধ্বনি ভেসে ওঠে। তার মানে কি এটাই বুঝতে হবে যে, কেন্দ্রের অধিগ্রহণ খেলা আর রাজ্যের সস্তায় চাল-গম অনুদানেই বাঁচবে ডুয়ার্সের চা-বাগান আর তার শ্রমিকরা ?

প্রশ্ন যখন একটি একটি করে সংখ্যায় বাড়ে, তখন তার উত্তর অনুসন্ধানও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পরপর ঘটনাগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে ফেলা যায়। ঘটনাক্রমের বিশ্লেষণে একেবারে নির্ভুল না হোক, সঠিক উত্তর অবশ্যই মেলে। কিন্তু কীভাবে বাঁচবে ডুয়ার্সের চা-বাগান আর তার শ্রমিকরা— এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটাই এখন সব থেকে বেশি দরকার। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। শাসকদলের নেতা-কর্মীরা ডুয়ার্সের বেশ কিছু চা-বাগানে গিয়ে ঘটা করে জানিয়ে

চা-বাগান পরিচালনার ভার সরকারের হাতে যেতে চলেছে— এই খবরে আর যারাই খুশি হোক না কেন, ওই ১৪ হাজার স্থায়ী-অস্থায়ী শ্রমিক এবং চা-বাগানগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে থাকা মানুষকে যে ততটা খুশি করতে পারেনি, সে কথা বলাই যায়। কারণ, কেন্দ্র বা রাজ্য এর আগেও আশার ছলনে ভুলিয়েছে ওইসব শ্রমিককে।

এসেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ডানকান গোষ্ঠীর অচল চা-বাগানগুলি ফের চালু হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই ফের চালু হবে বাগান, মিটিয়ে দেওয়া হবে বকেয়া। এসব কথা শুনে আশায় বুক বেঁধেছিল বন্ধ চা-বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিক। কিন্তু কয়েকটা দিন পরই জানা গেল, বিজ্ঞপ্তি জারি করে ডানকান গোষ্ঠীর সাতটি চা-বাগান কেন্দ্র চা-পর্ষদের হাতে তুলে দিচ্ছে। দোটানায় পড়ে গেল সাতটি চা-বাগানের প্রায় ১৪ হাজার স্থায়ী-অস্থায়ী শ্রমিক আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রায় লক্ষাধিক মানুষ। এই ক'দিন আগে, বাগান খুলছে, বকেয়া টাকাপয়সা মিলবে— এই আশায় যাঁরা একটু নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন, তাঁরাই পড়ে গেলেন দুশ্চিন্তায়। কারণ, মালিকপক্ষ ডানকানের তরফে বলা হল, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত তাঁরা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই খতিয়ে দেখছেন, তারপর পদক্ষেপ। নতুন করে আতান্তরে পড়ল শ্রমিকরা। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে মজুরি হাতে পাওয়ার কথা। তবে কি সেই মজুরিটুকুও হাতে পাওয়াও পিছাল?

চা-বাগান পরিচালনার ভার সরকারের হাতে যেতে চলেছে— এই খবরে আর যারাই খুশি হোক না কেন, ওই ১৪ হাজার স্থায়ী-অস্থায়ী শ্রমিক এবং চা-বাগানগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে থাকা মানুষকে যে ততটা খুশি করতে পারেনি, সে কথা বলাই যায়। কারণ, কেন্দ্র বা রাজ্য এর আগেও আশার ছলনে ভুলিয়েছে ওইসব শ্রমিককে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা ঠেকে এবং ঠকে শিখেছে। এ প্রসঙ্গে ডানকানের সাতটি চা-বাগানে ৩ জানুয়ারির ছবি তুলে ধরলে বুঝতে আরও সুবিধা হবে। বহুকাল পর চা-বাগানের অফিস খুলে সাফসুতরো করেছিল শ্রমিকরা। অভাবের দিন বুঝি শেষ হল এমন আশা ক্ষীণ হলেও তাদের মনের অন্দরে বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল। কিন্তু দিনভর অপেক্ষা করেও তারা হাতে পেল না বকেয়া বেতনের ছিটেফোঁটা। সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী ওই দিনই শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে যে বাগানগুলিতে স্বাভাবিক কাজ শুরু হওয়ার কথা তা সম্ভব হচ্ছে না। পাশাপাশি বকেয়া বেতনের প্রথম কিস্তি মেটানোরও প্রশ্ন উঠছে না। তার মানে দুর্দশার যূপকাষ্ঠে আবার বলির পাঁঠা সেই হাজার হাজার চা-শ্রমিক কর্মচারী।

উল্লেখ করার বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগ্রহণ সিদ্ধান্তকে বাম কিংবা ডান প্রায় সব শ্রমিক সংগঠনই স্বাগত জানাল। ওই সাতটি বাগান ছাড়া ডানকান গোষ্ঠীর বাকি বাগানগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েও কোনও কোনও শ্রমিক নেতার বক্তব্যে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল। সিপিএম এবং কংগ্রেসের চা-শ্রমিক সংগঠনগুলি ডানকানের অন্য বাগানগুলি নিয়ে রাজ্য সরকারের উপর চাপ বাড়াতে হবে এমন আলোচনাও শুরু করল। অথচ কেউ ভেবে দেখল না যে, কেন্দ্র সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মালিকপক্ষ আইনি পদক্ষেপ করতে বাধ্য। বরং প্রায় প্রতিটি শ্রমিক সংগঠন থেকে রাজনৈতিক সংগঠনই ডানকান গোষ্ঠীর ওই সাতটি বাগান ছাড়াও বাকি বন্ধ ও অচল বাগানগুলি যাতে রাজ্য সরকার

অধিগ্রহণ করে এমন দাবিতে সরব হয়ে উঠতে চাইল। শ্রমিক সংগঠনগুলির অধিকাংশ নেতাই প্রশ্ন তুললেন, কেন্দ্রের নির্দেশে যদি সাতটি চা-বাগানের সুরাহা ঘটে, তবে বাকি বাগানগুলির ক্ষেত্রে হবে না কেন! কেন্দ্রের পথে হেঁটে রাজ্য সরকার কি চা আইনের প্রয়োগ করতে পারে না, যাতে মালিকপক্ষ চাপের মুখে পড়ে— এমন মন্তব্যও শোনা গেল শ্রমিক সংগঠন থেকে। শ্রমিক নেতারা কেউ কেউ এমন দাবিও করলেন যে, চা-পর্ষদ তো কিছুদিন বাগানগুলি পরিচালনা করে অন্য কোনও মালিকের হাতে তুলে দিতে পারে। সেই হিসাবে রাজ্যের চা উন্নয়ন নিগম-এর পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে অন্য চা-বাগানগুলিও তো রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করতে পারে। ডানকান শ্রমিক সংগঠন এবং তাদের পোড় খাওয়া নেতৃবৃন্দের এ ধরনের মতামত থেকে তাঁদের আর্থ-রাজনৈতিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে যেমন প্রশ্ন জাগে, পাশাপাশি এই প্রশ্নও মনে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে যে, তাঁরা কি সত্যিই শ্রমিক মঙ্গলের কথা ভেবে সংগঠন করেন, নাকি শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের স্বার্থরক্ষাই তাদের মূল উদ্দেশ্য?

২৩টি চা শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক জিয়াউল আলম বললেন, দীর্ঘকাল ধরেই আমরা কেন্দ্রীয় চা আইনের দাবি করছিলাম। দেরিতে হলেও কেন্দ্র সেই পদক্ষেপ করছে। এবার রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে। শুধু সাতটি বাগান নয়, শ্রমিকদের স্বার্থে সব অচল চা-বাগান রাজ্য সরকারও অধিগ্রহণ করুক। পালটা তৃণমূলের চা শ্রমিক সংগঠন ডুয়ার্স ইউনিয়ন অব প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কারস ইউনিয়ন-এর সভাপতি মোহন শর্মা বললেন, মুখ্যমন্ত্রী ডানকান গোষ্ঠীর চা-বাগানগুলি খুলতে পদক্ষেপ করেছিলেন। আচমকাই কেন্দ্র বাগানগুলি টি বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, এতে ডানকান কর্তৃপক্ষ যে মুখ্যমন্ত্রীর চাপে বাগান খুলতে এবং বকেয়া পাওনা মেটাতে রাজি হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়া ভেস্তে গেল। মনে থাকতে পারে, ২০১৫-র ৩ নভেম্বর আলিপুরদুয়ারে একটি সরকারি সভার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী চা-বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে বলেছিলেন, যাঁরা বাগান চালাতে পারছেন না, তাঁরা আমাদের সে কথা জানান। আমরা বাগানের পরিচালনার ভার অন্য কোনও সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে চালাব। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় শিল্পমহল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলও বিস্মিত হয়েছিল। তাঁর সরকার যে ঋণের বোঝায় জেরবার, সে কথা তিনি নিজের মুখেই দানখয়রাতির মঞ্চে দাঁড়িয়েও প্রকাশ্যে বলেন। সেই বোঝার উপর তিনি ফের চা-বাগানের ভার চাপাতে চাইছেন। বন্ধ বা অচল চা-বাগান অধিগ্রহণ করা এবং ফের চালু করা মোটেও সহজ কাজ নয়, আজ মনে হয় সে কথা অত্যন্ত সাধারণ নাগরিকও জেনে-বুঝে ফেলেছেন। তা ছাড়া এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অত্যন্ত জটিলতা থাকায় অতীতে বহু চেষ্টাতেও তা কোনওবারই ফলপ্রসূ হয়নি। কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন প্রাথমিকভাবে এই প্রসঙ্গে এসেই যায়। যেমন, শ্রমিকদের পাওনাগন্ডা কে মেটাবে? নতুন কাউকে বাগান পরিচালনার ব্যবস্থা হস্তান্তর করলে কেন তারা সেই দায় নিতে রাজি হবে? তবে কি রাজ্য শ্রমিকের বকেয়া মেটানোর দায় নেবে? তাহলে তো সারদা-কাণ্ডের মতোই প্রশ্ন উঠবে, বাগান মালিকের আর্থিক দায় জনগণের টাকায় সরকার মেটাবে কেন?

চা বলয়ের অভিজ্ঞতা বলে, কোনও বাগান সরকার অধিগ্রহণ করলে সরকারি

কোষাগার থেকে বছরের পর বছর খয়রাতি দিতে হয়। রাজ্য চা উন্নয়ন নিগমের হাতে কিছুকাল আগে পর্যন্ত পাঁচটি চা-বাগান ছিল। বাম-আমলে অধিগৃহীত পাহাড়ে তিনটি ও ডুয়ার্সের দু'টি বাগান। কোনওটি লাভের মুখ দেখেনি কোনও দিন। বর্তমান সরকার বেচে দিয়েছে। ফলে চা-বাগান অধিগ্রহণ করে সরকার যদি চালানোর চেষ্টা করে, তবে কোষাগারের বেহাল দশা কঙ্কালে পরিণত হবে। তা ছাড়া সরকার তা পারবেও না। রাজ্য সরকারের সত্যিই যদি সদিচ্ছা থাকে, তবে সে চা-বাগান অধিগ্রহণের আইন পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রের উপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সে পথে তার চলা এখনও পর্যন্ত ততদূর নয়, যেখান থেকে কেন্দ্র বাধ্য হতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, কেন্দ্রীয় চা আইনে বাগান অধিগ্রহণ করে পরিচালনার ভার হস্তান্তরের প্রসঙ্গ আছে ঠিকই, তবে তা যথেষ্ট মজবুত নয়। চা আইন যদি সংশোধনও হয় তাহলে শ্রমিক সমস্যার বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার কি অভিযুক্ত মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হবে? এই প্রশ্ন অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। কারণ, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যদি না যথাযথ ব্যবস্থা না নিতে সচেষ্ট হয় অর্থাৎ শ্রমিকের বকেয়া থেকে শুরু করে চা-বাগানের যাবতীয় ঋণ শোধের সমাধান না হলে বন্ধ বা অচল চা-বাগানের দায় কোনও গৌরী সেনই কাঁধে নেবে না। অতীতে সে পথে হেঁটে হোঁচট খেয়েছে টি বোর্ড। অনেক প্রশ্ন বা সমস্যা জট পাকিয়ে আছে অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, যার মধ্যে থেকে আরও একটি সাধারণ প্রশ্ন সামনে এসেই যায়। রাজ্য বা কেন্দ্র, যে সরকারই চা-বাগান অধিগ্রহণ করুক না কেন, পুরোপুরি মালিকানা না পেলে অন্য সংস্থা শুধু বাগান পরিচালনার ভার নিতে কেন রাজি হবে? ওই জমি বন্ধক রেখে চা-বাগানের দায়িত্ব নেওয়া নতুন সংস্থা কি ঋণ নিতে পারবে? এক কথায় উত্তর, না। তার মানে নিজের পকেট থেকে টাকা ঢেলেই তাকে বন্ধ বা অচল বাগানের অবস্থা পালটাতে হবে। এটা কি ব্যবসার স্বাভাবিক অঙ্কে কোনও ভাবে বাস্তবসম্মত? এর উত্তরও এক কথায়, না। তাহলে রাজ্য অধিগ্রহণ করছে অথবা কেন্দ্র করছে— এসব বিবৃতি বা খবরকে ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? যা-ই বলা যাক না কেন, সেসব শুনে-বুঝেও শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল স্বাগত জানান, বেকার-ভুখা শ্রকিমদের মনে আশা সঞ্চারিত করেন।

লঙ্কাপাড়া, হান্টাপাড়া, ডিমডিমা, তুলসীপাড়া, গ্যারগান্ডা, ধুমচিপাড়া ও বীরপাড়া— এই সাত চা-বাগান অধিগ্রহণ মোতাবেক কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের গেজেট বিজ্ঞপ্তি জানায়, ১৯৫৩ সালের ভারতীয় চা আইনের ২৯ নং ধারার ১৬-ই উপধারা অনুযায়ী কেন্দ্র ওই বাগানগুলি অধিগ্রহণ করে নিচ্ছে। কোনও চা-বাগানে অচলাবস্থা চলতে থাকলে তা চা আইন অনুসারে কেন্দ্র অধিগ্রহণ করতে পারে— এটাই যে কেন্দ্রের যুক্তি তা সাধারণভাবে বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিজ্ঞপ্তি এও জানায় যে, চা আইনের ৩(ক) ধারা অনুযায়ী বাগান পরিচালনার ভার সঁপে দিয়েছে চা পর্ষদকে। গেজেটে জানানো হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের চা-বাগান পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে কেন্দ্রের কাছে চা-বাগান পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট পৌঁছেছে, সেসব বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে ডানকানের আওতাধীন চা-বাগানগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। ওই শিল্পগোষ্ঠীর ১৪টি চা-বাগান পরিদর্শন করে টি বোর্ডের পক্ষ থেকেও একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারও কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট দিয়েছিল। সব মিলিয়ে কেন্দ্র সরকারের এই পদক্ষেপ বিশেষ করে ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে অন্য বার্তা বহন করছে তা বুঝতেও অসুবিধা হয় না। কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয় রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে বিধানসভা ভোটের আগে রাজনীতির খেলা বলেই মন্তব্য করেন। পাশাপাশি বহু শ্রমিক সংগঠন বাম-ডান উভয়ই কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। শাসকদল কতটা ক্ষুব্ধ হল আর চা শ্রমিক সংগঠনগুলি কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে অধিগ্রহণ নিয়ে আর কোন দাবিতে সরব হল, সেগুলি শুধু আজ নয়, সে দিনও অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ছিল। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্-মুহূর্তে কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্ত অভিসন্ধিমূলক হলে ক্ষুব্ধ হওয়া ও স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে তা অবশ্যই চরম মূর্খামির নামান্তর।

কেন্দ্র তার বিজ্ঞপ্তিতে চা-বাগান পরিচালনার ভার দিয়েছিল টি বোর্ডকে। প্রশ্ন, বাগানগুলি টি বোর্ড চালাবে কীভাবে? বাগান পরিচালনার পরিকাঠামো কি তাদের আছে? মেনে নেওয়া গেল, এ ক্ষেত্রে তারা কোনও এজেন্সির হাতে সেই দায়ভার অর্পণ করবে। কিন্তু সেই এজেন্সিকেও অবশ্যই হতে হবে সরকারি এবং চা-কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এ রাজ্যে তেমন কোনও সরকারি এজেন্সির সন্ধান কি পাওয়া যাবে? বহুকাল আগে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন টি ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (টিটিসিআই) নামে এক সংস্থা ছিল। আজ তা স্রেফ ইতিহাস। পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের আওতাধীন ডব্লুবিটিডিসি বা পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগম নামে এক সংস্থার কথা আমরা জানি। ওই সংস্থার অধীনে থাকা পাঁচটি চা-বাগান ২০১৫ সালের মাঝামাঝি রাজ্য সরকার নিলামে বিক্রি করে দেয়। কেন্দ্র বা টি বোর্ড কি ওই দু'টি সংস্থার কথা কোনক্ষ্ম ওভাবে তাদের বিবেচনায় এনেছিল? তাদের ভাবনায় থাক না থাক, ওই দু'টি সংস্থার পুনরুজ্জীবনের দাবি কিন্তু জোরালো হয়ে উঠল চা বলয়ের শ্রমিক সংগঠনগুলিতে। কেন্দ্র চা আইনের আমূল পরিবর্তন না করলে, চা পর্ষদ বাগানগুলিকে বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশন (বিএফআইআর)-এর হাত থেকে বার করে না আনলে চা-বাগান অধিগ্রহণ

রাজ্য সরকারের সত্যিই যদি সদিচ্ছা থাকে, তবে সে চা-বাগান অধিগ্রহণের আইন পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রের উপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সে পথে তার চলা এখনও পর্যন্ত ততদূর নয়, যেখান থেকে কেন্দ্র বাধ্য হতে পারে।

করা কি কোনওভাবে সম্ভব? এক কথায়, না। এর আগে টি বোর্ডও উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশের সক্রিয়তাও আদালতে হোঁচট খেয়েছিল। অথচ রাজ্য কেন্দ্রীয় নীতির পালটা চালে কল্পতরু হয়ে উঠল। শ্রম দপ্তর জানাল, ২ টাকা নয়, ৪৫ পয়সা কেজি দরে এখন থেকে চা শ্রমিক এবং চা-বাগানবাসীরা চাল, গম, আটা পাবে। শ্রম দপ্তরের ঘোষণা অনুসারে খাদ্যপণ্য সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হবে চা-বাগান মালিকদের। তবে গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখবে দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত নয় সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি। রাজ্যের এই পালটা নীতিও যে বিধানসভা ভোটের আগে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা, তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। তা ছাড়া বিভিন্ন সূত্রের খবর এবং নিজেদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে টি বোর্ড সাম্প্রতিককালে ডানকানের ১৪টি বাগান সম্পর্কে যে রিপোর্ট কেন্দ্রকে পাঠিয়েছিল, তাতে গুরুত্ব পেয়েছিল রাজ্য সরকারের মতামতও। কেন্দ্র যে তার ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে তা কি রাজ্য সরকার অনুমান করতেও পারেনি?

অন্য দিকে রাজ্য সরকারের কল্পতরু নীতিতে মজুরির অংশ হিসেবে শ্রমিকরা যে রেশন পেত তা তারা আর পাবে কি না, রেশন না পেলে সেই বাবদ বরাদ্দ টাকা মজুরির সঙ্গে মিলবে কি না, তাও শ্রম দপ্তরের বক্তব্যে অস্পষ্ট। তবে রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে চা-বাগান মালিকরা যে সরকারের তরফে বাড়তি সুবিধা পেলেন, সেটা ভাবাই যায়। তেমনই কেন্দ্রীয় নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে যে ডানকান কর্তৃপক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হবে, সেটাও ভাবা যায়। ফলত, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের চুক্তি অনুসারে বাগান খোলা এবং কিস্তিতে শ্রমিকদের পাওনা মেটানোর প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। বন্ধ চা-বাগান এবং শ্রমিকদের ভবিষ্যতে জমা হয় আরও অন্ধকার। চা-বাগানের মরশুম অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকে গাছের পাতা তোলার সময়। এর পর উৎপাদন শুরু হওয়ার কথা অথচ চা-বাগান বন্ধ। বাগান কর্তৃপক্ষ ডানকানস আদালতে মামলা করায় চা-বাগান খোলা কার্যত অনিশ্চিত। ওদিকে চায়ের ভরা মরশুমে বাণিজ্যিকভাবেও একেবারে মুখ থুবড়ে পড়তে হল বাগানগুলিকে। এরকম পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার বল ঠেলে দিয়েছে কেন্দ্রের কোর্টে। চা-বাগানগুলিকে তাদের দানখয়রাতির কথা আরও বড় গলায় প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। তার মানে কি এটাই বুঝতে হবে যে, ডুয়ার্সের চা-বাগান আর শ্রমিকরা বাঁচবে অনুদানে?

তপন মল্লিক চৌধুরী
ছবি: রাজেন প্রধান

দৈনিকের খবরে মন্ত্রী মর্মাহত এত সরকারি সাহায্য তবুও...

কত মেকআপ। উজ্জ্বল লিপস্টিক, রঙিন রুমাল উড়িয়ে খদ্দের ধরছে চা-বাগানের মেয়ে। প্রভাতি সংবাদপত্রের ব্যানার হেডলাইন। সংবাদ পড়ে মর্মাহত রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী। তাঁর আক্ষেপ, সরকার এত চেষ্টা করছে... তবুও...। সংবাদপত্র পড়ে মন্ত্রীকে জানতে হল? উত্তরের চা-বাগানে দু'দশকের বেশি সময় ধরে এমনটাই ঘটে চলেছে। আর এও তো কোনও নতুন কথা নয় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন গঙ্গা-পদ্মার ভাঙন কিংবা আয়লা। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, বাগান বন্ধ হয়ে আয়ের সমস্ত পথ হারিয়ে ফেলা উন্নয়নের দাপটে জমি-জঙ্গল-জলাশয় হারিয়ে ফেলা, উন্নয়ন কিংবা দেশভাগ অথবা স্বৈরাচারী শাসনে উদ্‌বাস্তু হওয়া পরিবারের মহিলা সদস্যটি, মেয়ে-বউটি আসলে সব থেকে বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে। চা-বাগানের আড়কাঠি আর মাসিদের দাপাদাপিতে এরকমটাই স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক আরও এই কারণে যে, সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই ওরাওঁ, মুন্ডা, সাঁওতাল অর্থাৎ ঝাড়খণ্ডী আদিবাসী, গোর্খা ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষকে আমরা কোনও দিন মানুষ বলেই মনে করিনি। স্বাধীনতার পর বাগিচা শ্রমিক আইন হয়েছে বটে, কিন্তু সে আইন পুঙ্খানুপুঙ্খ দূরে থাক, সম্মানজনকভাবে মালিকপক্ষ মানবে এমন পরিস্থিতিও কখনও তৈরি হয়নি।

চা-শ্রমিকরা আজও ১৯৪৮ সালের 'মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট' অনুযায়ী বেতন বা মজুরি পান না। সর্বনিম্ন মজুরি কত হবে, তার এক ফর্মুলা গৃহীত হয়েছিল ১৭৫৭ সালে— না, তার সুফল বাগিচা শ্রমিকদের মেলেনি। ১৯৮৮ সালে শ্রম মন্ত্রীদের বৈঠকে যে পরিবর্তনশীল মহার্ঘ ভাতার কথা বলা হয়েছিল, সে কথা চা-বাগানে উচ্চারণ করা মানা। দীর্ঘ ১১ মাস নানা আন্দোলন করে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে রাজ্য সরকার, চা-কর ও চা-শ্রমিক ইউনিয়গুলির মধ্যে যে চুক্তি হল, তাও সেই ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা সাময়িক চুক্তিভিত্তিক এক হাজিরা প্রথা। এই চুক্তির আগে পর্যন্ত পাহাড়ে একজন চা-শ্রমিক পেতেন দৈনিক ৯০ টাকা ও ডুয়ার্স-তরাইয়ে ৯৫ টাকা। রাজ্যে ১০০ দিনের কাজে একজন অদক্ষ শ্রমিক এর প্রায় দ্বিগুণ টাকা পেতে পারেন। কোনও কৃষি শ্রমিক রাজ্যের কোথাও এত সামান্য মজুরি কি পান? উত্তর— না।

বাগিচা মালিকরা বলে থাকেন, মজুরির পাশাপাশি প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী শ্রমিকদের বিনামূল্যে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, চিকিৎসার সুবিধা, আবাসন, ক্রেশের সুবিধা দেওয়া হয়। এ ছাড়া শ্রমিকদের দেওয়া হয় ছাতা-চটি-গাউন। চা-বাগানের সঙ্গে পরিচিত প্রতিটি মানুষ জানেন, এর মধ্যে কত বড় মিথ্যা লুকিয়ে রয়েছে। জানেন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা থেকে শুরু করে আরও বড় নেতা, মন্ত্রী, আমলা প্রত্যেকে।

আর চা-বাগান রুগ্‌ণ হয়ে পড়লে, বন্ধ হয়ে গেলে যে শ্রমিকটি মাসে ২২০০-২৪০০ টাকা রোজগার করতেন, তিনি পরিবার নিয়ে কোথায় দাঁড়ান। একে তো মজুরির বঞ্চনা, তার উপর ঘরে ঘরে বেকারত্ব— বাগান ছাড়া কাজের কোনও সুযোগ নেই। নদীতে পাথর ভাঙা, জঙ্গলের কাঠ কাটা পেশা বটে। ডানকানের ১২টি চা-বাগানে ২০১২-১৩ সালে সমীক্ষা করে শ্রম দপ্তর দেখেছিল, সেখানে মোট জনসংখ্যা ৭৪,১৯০। আর বাগানে কর্মরতের সংখ্যা নিয়মিত-অনিয়মিত মিলিয়ে ১৮,৩২৩। কর্মহীনের সংখ্যা ৪৯,১৯৭। প্রায় এক বছর হতে চলল কর্মহীন শ্রমিকরা। এ ছাড়াও বন্ধ বা রুগ্‌ণ আরও প্রায় ৪০টি বাগান।

সেখানকার শ্রমিক পরিবারগুলি কেমন আছে একটু দেখে নেওয়া যাক। আগেই বলেছি, শেষ চুক্তির আগে ২০১৪ সালে শ্রমিকদের মজুরি ছিল ৯৫ টাকা। অথচ ২০১৪ সালে রাজ্য সরকারের ঘোষিত দৈনিক মজুরি ছিল ১৯৩ টাকা।

বীরসা ওরাওঁ— বীরপাড়া চা-বাগানের শ্রমিক বস্তির বাসিন্দা বীরসার বয়স ৫৬। বীরসা ও তাঁর স্ত্রী এটাওয়ারি দু'জনে চা-বাগানের

২০০২ সাল থেকেই দেশান্তরী হওয়ার বা ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে চলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। বাগানের নারী ও শিশুরা একরকম পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যাটা উত্তরোত্তর বেড়েছে বই কমেনি। রাজ্য সরকার ও ইউনিসেফ-এর যৌথ সমীক্ষাও দেখাচ্ছে, রাজ্যের কয়েকটি জেলায় শিশু ও নারী পাচার 'মহামারি'র আকার নিয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬(এ) বা ৩৭২ ধারায় অপরাধের পরিমাণ বাড়ছে।

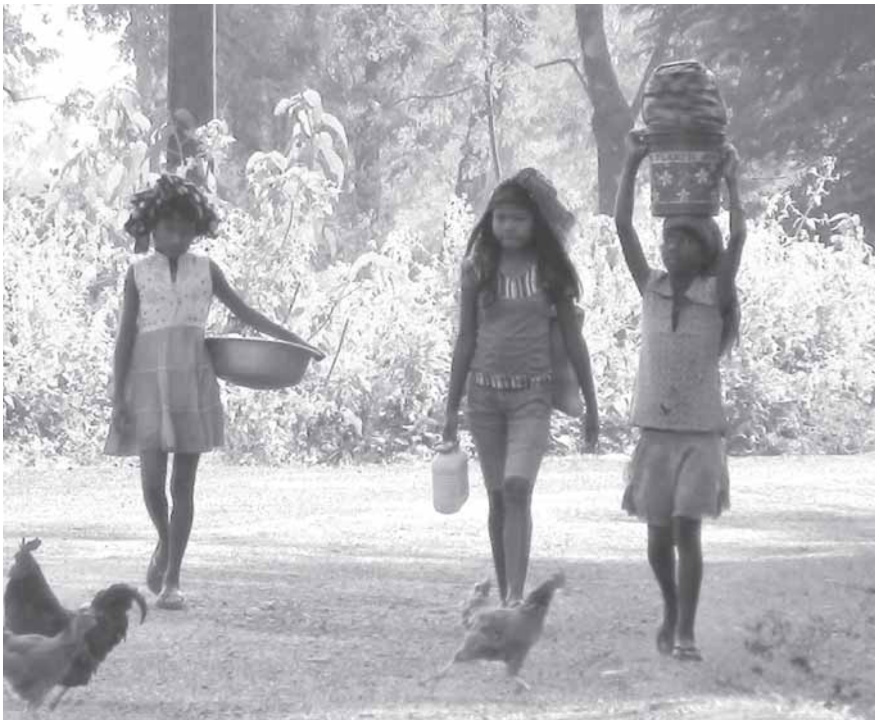

অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। তাঁদের দুই ছেলের বড় জন বাগানের স্থায়ী শ্রমিক, ছোট জন বিঘা বা অস্থায়ী কর্মী। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বাগানের মজুরি বন্ধ। এর পর দু'জন ঠিকা নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করে। মোটামুটি সপ্তাহে তিন দিন কাজ মেলে। রোজ ১৮০ টাকা। চা-বাগান খোলা থাকাকালীন পারিবারিক আয় ছিল চার হাজার টাকা মতো। পরিবারের কারও রেশন কার্ড নেই। এক বছর ধরে কোম্পানির রেশনও পায়নি।

সংগীতা ওরাওঁ— ৩৫ বছরের এই মহিলা বীরপাড়া চা-বাগানের পার্মানেন্ট শ্রমিক ছিলেন। স্বামী ছাড়াও রয়েছে তিনটি শিশুসন্তান। মজুরি পেতেন ২২০০ টাকা। বর্তমানে তাঁর স্বামী ভুটানে কাজ করে টাকা পাঠান। দু'-তিন মাস অন্তর হাতে আসে ১৪০০ টাকার মতো। সংগীতার ১৫ বছরের মেয়ে সুমন গান্ধাপাড়া চা-বাগানে পাতা তোলার কাজ করত স্কুল ছুটির সময়। এভাবে এক-এক ছুটির সময় আয় করত ৮০০-৯০০ টাকা।

কাস্টি মিলজ— বয়স ৩৫। বাড়িতে পাঁচটি মুখ। স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ে। ঠিকা বা বিঘা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে কাস্টি ও তাঁর স্ত্রী প্রত্যেকে মাসে ১৬০০-১৭০০ টাকা রোজগার করত। কাস্টি এখন স্থানীয় বাজারে মেকানিকের সহকারী হিসাবে কাজ করেন— সপ্তাহে ৬০০-৭০০ টাকা আয় করেন। তাঁর স্ত্রী অন্য খোলা বাগানে পাতা তোলার কাজে যান। তাঁর আয় সপ্তাহে ৭০০ টাকার মতো। বিগত ছ'বছরে এই পরিবারটি বাগান কিংবা সরকার কোথা থেকেও কোনও রেশন পায়নি।

জুসপাইন মুন্ডা— বয়স ৬০। ডুমচিপাড়া বাগানের বাসিন্দা। কর্মরত অবস্থায় মাসে ২২০০-২৩০০ টাকা আয় করতেন। জুসপাইন কর্মহীন। তাঁর স্বামী নদীতে পাথর ভেঙে মাসে ১২০০ টাকার মতো রোজগার করেন। তাঁদের কোনও রেশন কার্ড নেই। বাড়িতে অসুস্থ মেয়ে। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভরসা।

মুক্তা মুড়া— ৩৫ বছরের এই যুবতী ডুমচিপাড়া চা-বাগানের বাসিন্দা। স্বামী দেশপাল বাগানের কর্মী। মোটামুটি আয় ছিল ১৮০০-১৯০০ টাকা মাসে। বাগান বন্ধ। দেশপাল দেশান্তরী হয়ে ভুটানে। সেখান থেকে মাসে ১৪০০-র মতো টাকা পাঠান। মুক্তা নদীতে পাথর ভাঙেন, অনিয়মিত কাজ, মাসে শ'তিনেক টাকার মতো হাতে আসে। মুক্তার একটা পাঁচ বছরের শিশুপুত্র রয়েছে। তার নাম লামন।

(সূত্র- রাইট টু ফুড ওয়ার্ক ক্যাম্পেন— ওয়েস্ট বেঙ্গল, সেপ্টেম্বর ২০১৫)

এর পরেও কি চা-বাগানে রঙিন রুমালের ফাঁসে জড়িয়ে পড়বে মেয়েরা? চা-বাগান থেকে শ্রমিকরা বা শ্রমিক পরিবারের সন্তানরা যে দেশান্তরী হচ্ছে, এ তো নতুন কোনও কথা নয়। ২০১১ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ একটি সমীক্ষা করেন ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০০২ সাল থেকেই দেশান্তরী হওয়ার বা ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে চলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। বাগানের নারী ও শিশুরা একরকম পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যাটা উত্তরোত্তর বেড়েছে বই কমেনি। রাজ্য সরকার ও ইউনিসেফ-এর যৌথ সমীক্ষাও দেখাচ্ছে, রাজ্যের কয়েকটি জেলায় শিশু ও নারী পাচার 'মহামারি'র আকার নিয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬(এ) বা ৩৭২ ধারায় অপরাধের পরিমাণ বাড়ছে। অর্থাৎ, শিশু পাচার, বিক্রির অভিযোগ বাড়ছে।

দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড ফোরাম বেশ কিছুদিন আগেই জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে জানিয়েছিল যে, উত্তরবঙ্গের বাগিচাগুলিতে পাচারের ঘটনা বাড়ছে। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অমিত সরকারের মতে, ডানকানে অচলাবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাস অবধি ১৭০০ নারী ও শিশু বাগান ছেড়েছে। তাঁর আশঙ্কা, এর একটা বড় অংশই পাচারের শিকার। চা-বাগান বন্ধ হলে এমনটা যে হয় তা অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর চার বছর আগের সমীক্ষাও প্রমাণ করে। ইনদং, রেড ব্যাঙ্ক, সামসিং, গ্রাসমোর, নয়াশৈলি, ঢেকলাপাড়ার মতো রুগ্‌ণ বা বন্ধ চা-বাগানগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছিলেন পাচারের ভয়াবহতা।

ওই রঙিন রুমাল প্রমাণ করে, সমাজ মৃত, সরকার নেই। তারা নেইরাজ্যের, বাসিন্দা এক মৃত্যু উপত্যকার।

দেবাশিস আইচ

ছবিঃ রাজেন প্রধান

উত্তরের অপেক্ষায় এবার গোটা রাজ্য

বছর পাঁচেক বাদে আবার সেই নির্বাচনের ঘণ্টা বাজার সময় আসন্ন। মিডিয়ার ক্লান্তিহীন ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ কিংবা উদ্দেশ্যপূর্ণ ইঙ্গিত জনগণকে এখনও পুরোপুরি জাগিয়ে তুলতে না পারলেও বাজার গরম হতে শুরু করেছে। সনিয়া নাকি রাহুল? চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কে নেবেন? দিল্লির মসনদ নাকি রাজ্যে রাজ্যে অস্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা? কোনটি অগ্রাধিকার পাবে? উত্তরের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে গোটা রাজ্য। আবার বাম-কং জোট হলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা না দেখা গেলেও উত্তরবঙ্গের সমীকরণ অনেকটাই বদলে দিতে পারে ফলাফলের অঙ্ক। তাই উত্তরের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা বাংলা।

রাজ্যে যে প্রবল জোটের হাওয়া বইছে তা হাড়ে হাড়ে বুঝছে হাইকম্যান্ড ও পলিটব্যুরো। বাংলায় জোটের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত রাহুল গান্ধি ও সীতারাম ইয়েচুরিরা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ঘোষণা করেননি। কিন্তু দুই শিবিরের নেতারাই বুঝতে পারছেন নিচুতলার কর্মীরা প্রবলভাবে জোট চাইছেন। তাই বাম-কংগ্রেস উভয় পক্ষের নিচুতলায় যে জোটের পক্ষে হাওয়া বইছে তা নেতারা অস্বীকার করছেন না। জোটের পক্ষে যে ভোটের পাটিগণিত উঠে আসছে, সেই পাটিগণিতই দুই শিবিরের নিচুতলাকে আরও উৎসাহিত করে তুলেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বঙ্গে জোট না হলে ভোটের রায়দানে দুই শিবিরেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

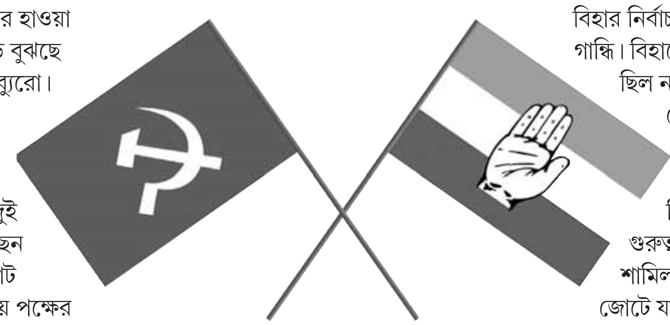

জোটের যখন এতটাই প্রয়োজনীয়তা, তখন জোট আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে দুই শিবিরের মাথারা গড়িমসি করছেন কেন? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, মতাদর্শগত বস্তুটাকে অক্ষুণ্ণ রেখে কীভাবে জোট ঘোষণা করা যায়, তারই খোঁজ চলছে। এই কারণেই জোটের সলতে পাকানো শেষ হলেও প্রদীপ জ্বালানো যাচ্ছে না। মতাদর্শগত বিষয়টি নিয়ে সিপিএমের মাথাব্যথাই অবশ্যই বেশি। এই বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করতে ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক, তারপর চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই অবস্থায় শিলিগুড়িতে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র জানিয়েছেন, 'শীর্ষস্তরে কী সিদ্ধান্ত হবে জানি না, তবে মানুষের জোট হয়ে গিয়েছে'। অন্য দিকে, জোটের পাটিগণিত মাপছেন রাহুল-সনিয়ারাও। কংগ্রের সূত্রে খবর, জোটকে বাস্তবের জমিতে আনতে রাহুল গান্ধি ও সীতারাম ইয়েচুরির বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকের পর সংসদ ভবনে সিপিআইএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে বৈঠকে বসেন কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য ও আইসিসি'র তরফে পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত সি পি জোশি।

বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করলে বলতে হবে, জোটের বল এখন একটু দ্রুতই গড়াচ্ছে। কিছুদিন আগেও বাম ও কংগ্রেসের মধ্যে ভোট চালাচালি হবে কি না তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হলেও কংগ্রেসের ভোট বামেদের দিকে আসবে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না বঙ্গ সিপিএমের শীর্ষনেতারা। অন্য দিকে, খোলাখুলি জোটের কথা বলে কংগ্রেসের অন্দরে তেমন সাড়া পাননি আবদুল মান্নান, প্রদীপ ভট্টাচার্য ও ওমপ্রকাশ মিশ্ররা। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দুই শিবিরের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে জোটের পক্ষে ক্রমশ জোরালো রব ওঠায় শীর্ষনেতাদের নড়েচড়ে বসতে হয়েছে।

বিহার নির্বাচন থেকেই রাজ্যস্তর থেকে উঠে আসা দাবি মানতে শুরু করেছেন রাহুল। তার আগে পর্যন্ত একলা চলার নীতির পক্ষেই ছিলেন কংগ্রেসের সহসভাপতি। রাহুল গান্ধি উপলব্ধি করেছেন, আঞ্চলিক নেতৃত্বের দাবি ও গুরুত্বকে প্রাধান্য না দিয়ে চরম ভুল হয়েছে। এর ফলে গত এক দশকে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস দুর্বল হয়েছে। এই উপলব্ধির কারণেই বিহার নির্বাচনে নীতি বদল করেছেন রাহুল গান্ধি। বিহারে নীতীশ নিয়ে কোনও আপত্তি ছিল না তাঁর। তবে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির লেবেল গায়ে লাগা লালুপ্রসাদের সঙ্গে হাত মেলানোয় আপত্তি ছিল রাহুলের। শেষ পর্যন্ত বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের মতকে গুরুত্ব দিয়ে লালু-নীতীশের জোটে শামিল হয় কংগ্রেস। বিহার নির্বাচনে জোটে যাওয়ার পক্ষে সেই রাজ্যের নেতারাও নিচুতলার চাপের কথা রাহুলকে বোঝাতে পেরেছিলেন। জোটে গিয়ে বিহারে হাতে গরম ফল পেয়েছে কংগ্রেস। ফলে বিহার মডেল ঘিরেই আশার আলো দেখছেন কংগ্রেসের বঙ্গ ব্রিগেড।

নিচুতলার মতকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা মানছেন সিপিএমের নেতারাও। সিপিএমের রাজ্য কমিটির এক নেতার কথায় গত দেড় দশকে দলের মধ্যে অবহেলিত হয়েছে নিচুতলার স্বর, যার ফলে দলের সংগঠনে অনেক ফাঁকফোকর তৈরি হয়েছে। ক্ষমতার কাজল চোখে লেগে থাকার সময়ে তা ধরা পড়েনি। এই কারণে ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। এবার তাই নিচুতলার দাবি মেনেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সূর্যকান্ত মিশ্ররা জোটের পক্ষে সওয়াল করছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতের অমিল থাকলেও জোট করতে মতাদর্শের মোড়ক থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে চাইছেন। তবে জোট নিয়ে দুই শিবিরের কেরল লবির তীব্র আপত্তি রয়েছে। কিন্তু বঙ্গের কংগ্রেস ও সিপিএম নেতৃত্ব সেই আপত্তি মানতে নারাজ। তাঁদের মতে, কেরলে যদি বামেদের অস্বস্তি হয়, সেই অস্বস্তিতে কংগ্রেসেরও হবে। তাহলে তো বিষয়টি সেখানেই কাটাকুটি হয়ে যাবে। কোনও পক্ষই কেরল নির্বাচনে বিষয়টিকে ইস্যু করতে পারবে না।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতা রাহুলকে বুঝিয়েছেন অধীররা। তিনি রাহুল গান্ধিকে বলেছেন, সিপিএমের হাতে সবচেয়ে বেশি হেনস্থা হতে হয়েছে তাঁকে। সবচেয়ে কঠিন লড়াইটাও তাঁকেই লড়তে হয়েছে। কিন্তু এখন নিচুতলার দাবিকে অগ্রাহ্য করলে ভুল হবে। সেই দাবিকে মান্যতা দিতেই জোটের পক্ষে সওয়াল করেছেন। জোটের পাটিগণিতটা আবার রাহুল-সনিয়াকে বুঝিয়েছেন কংগ্রেস নেতা ওমপ্রকাশ মিশ্র। তিনি সনিয়াকে বলেন, জোট হলে উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলা ও মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার একটি ছোট অংশ ধরলে ১০০টির বেশি আসনে তৃণমূল বিপন্ন হবে। তাঁর হিসেবমতো, এর পরে থাকছে বিজেপি-র ভোট।

জোটপন্থীদের মতে, গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যে ভোট পেয়েছিল, এবার বিধানসভা নির্বাচনে সেই ভোট তারা পাবে না। গত লোকসভা নির্বাচনে মোদি-ঝড়ে ভর করে ১৭.০৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল বিজেপি। তারপরে সেই অনুকূল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি সংগঠন বা সমর্থন বাড়াতে পারেনি। ফলে মোদি-হাওয়া থেমে যেতেই বিজেপি-র সমর্থনের ভিত দুর্বল হতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, বিজেপি যে বাড়তি ভোট পেয়েছিল তা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পাবে না।

এখন প্রশ্ন হল, সেই ভোট কোন দিকে যাবে। পাটিগণিত বলছে, গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র ভোট ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৭.৬ শতাংশ হয়েছিল। আর বামেদের ভোট কমেছিল ১০.৬ শতাংশ। অর্থাৎ অঙ্ক বলছে, বামেদের ভোটই বিজেপি-র ঝুলিতে গিয়েছিল। এই ভোট যদি বাম-কংগ্রেস জোটের দিকে যায় তাহলে ১৭০টি আসন পেতে পারে তারা। তবে রাজনীতির অঙ্কে সবসময় দুয়ে দুয়ে চার না হয়ে পাঁচও হয়। তবে সনিয়া গান্ধি যদি ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেন, তবে তিনি জোটে সিলমোহর দেবেন না। কারণ সে ক্ষেত্রে তৃণমূলকে সঙ্গে রাখাই লাভ।

২০১৯ পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভায় কংগ্রেসকে সমর্থন দেওয়ার প্রস্তাব সনিয়ার বাড়ি গিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তৃণমূলকে পেলে সংসদে বিজেপি সরকারকে নাস্তানাবুদ করা সহজ হবে। এই অবস্থায় সনিয়ার উপরেই নির্ভর করছে জোটের ভবিষ্যৎ। তবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের উপর পুরো ভরসা রাখতে পারেননি রাহুল গান্ধি। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি জানতে তিনি গোপনে দূত পাঠিয়েছেন বলে কংগ্রেস সূত্রে খবর। সেই দূত কী খবর দেয়, সেদিকেও তাকিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

পাহাড়ের রাজনীতিতে অন্য মাত্রা আনবে হরকা ও তাঁর নতুন দল

আগামী দিন পাহাড়ে কি অতীতের মতোই অন্য সব রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা দমিয়ে দিয়ে শুধু একটি দলই রাজ করবে? নাকি গণতান্ত্রিক পরিবেশে রাজনীতি-মত নির্বিশেষে সব দলই তার অস্তিত্বকে জাহির করতে পারবে? কার হাতে থাকবে পাহাড়ের রাজনৈতিক ক্ষমতার রাশ, হরকা না গুরুং? পাহাড়ে বরফ পড়ছে শুনে ছুটে আসা পর্যটকদের ফের মাঝপথ থেকে ফিরে যাওয়ার হুমকি দেবে না তো কেউ? এসব প্রশ্ন হয়ত ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে ডালপালা মেলবে না, কিন্তু বীজ ইতিমধ্যেই পাহাড়ের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়ে গিয়েছে। উত্তর ভবিষ্যতে মিলবে নিশ্চিত। আপাতত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভাজনের পাহাড়-নীতি, মোর্চা তথা গুরুঙের ডানা ছাঁটা এবং হরকা বাহাদুর ছেত্রির নতুন দল গঠন— সব মিলিয়ে পাহাড়ের রাজনীতিতে যে বদল ঘটছে, তা মানতেই হবে।

পাহাড়ের রাজনীতির এই প্রকৃতি বদল একদিনের ঘটনা নয় ঠিকই। তবে হরকা বাহাদুর ছেত্রির 'জন আন্দোলন পার্টি' দলের ঘোষণা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যময়। ভৌগোলিক কারণে যেমন প্রকৃতির চরিত্র এলোমেলো হয়, রাজনীতিও তেমনই সময়কে অদ্ভুতভাবে ওলটপালট করে দেয়। এক সময় পাহাড়ে অবিসংবাদী নেতা জিএনএলএফ সুপ্রিমো সুভাষ ঘিসিঙের ছায়াসঙ্গী ছিলেন যিনি, সেই বিমল গুরুং হয়ে উঠলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা তথা পাহাড়ের একচ্ছত্র অধিপতি। আবার তাঁরই বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সঙ্গী হরকা বাহাদুর ছেত্রি সম্প্রতি তাঁর শহর কালিম্পঙে ঘোষণা করলেন নতুন দল 'জন আন্দোলন পার্টি'। ইতিমধ্যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর থেকে আদায় করেছেন কালিম্পং জেলা। তার উপর হরকা তাঁর নতুন দলের কর্মসূচির প্রথমেই রেখেছেন মোর্চার দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন। এরকম অবস্থায় হরকার নতুন দল যে পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, সে কথা আর বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না।

পাহাড়বাসী দীর্ঘদিন সহিংস আন্দোলন আর তার প্রতিক্রিয়ায় রক্তপাত, জীবনহানি প্রত্যক্ষ করেছে। টানা বন্ধ ও পর্যটকদের বিপাকে ফেলে পর্যটননির্ভর অর্থনীতিরও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়েছে। হরকা যে সে পথে হাঁটবেন না বা তাঁর দল দাবি আদায়ের আন্দোলনে সেমুখো হবে না তা বলাই বাহুল্য। তাহলে কী হবে তাদের আন্দোলনের অভিমুখ? কতদিন শুধুমাত্র মোর্চার দুর্নীতির কথা বলে পাহাড়ে রাজনীতি করতে পারবে নতুন দল? পাহাড়ে অর্থনীতি বলতে একমাত্র পর্যটনই ভরসা। পাহাড়ের পরিস্থিতি পর্যটকদের আসা-যাওয়ার অনুকূলে থাকলে, পর্যটনের পরিকাঠামো আরও উন্নত হলে অর্থনীতিতে হেরফের ঘটতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পাহাড়ের আর্থ-সমাজ-রাজনীতির পরিবর্তন মানে তো উন্নয়ন। পাহাড়বাসী যদি উন্নয়ন বলতে পৃথক রাজ্য গঠনের কথাই বিশ্বাস করেন তাহলে তো সেই দাবিকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়। আর তা যদি না হয় তাহলে পাহাড়ে নতুন কোনও রাজনৈতিক দল কি পাহাড়বাসীর আস্থাভাজন হতে পারবে?

উন্নয়নের নামে ডিজিএইচসি খাতে বহু টাকা আদায় করেছিলেন সুভাষ ঘিসিং। কিন্তু তার সুফল পৌঁছায়নি সাধারণ পাহাড়বাসীর কাছে। মানুষের জমে থাকা সেই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে মোর্চা তথা বিমল গুরুং সুভাষ ঘিসিংকে পাহাড়ছাড়া করেছিলেন। বিমল গুরুংও আধিপত্যের অহংকারে একের পর এক হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফল না ভেবেই। হরকা মোর্চা বিরোধী আন্দোলনে স্পষ্টতই জানাচ্ছেন, জিটিএ কর্মসূচি তৈরি করেছে ঠিকাদার আর সুবিধাভোগীরা। জিটিএ-র নামে পাহাড়ে লুটের রাজনীতি করে পকেট ভারী হয়েছে মোর্চা নেতৃত্বের। এ কথা ঠিক, সুভাষ ঘিসিঙের পথে হাঁটছে মোর্চা তথা গুরুং। পাহাড়ে তাঁদের পতন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

পাহাড়ের নতুন দল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে সমর্থনের বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু না জানালেও তারা যে কার্যত তৃণমূলের দিকেই ঝুঁকে আছে, অন্তত পক্ষে বিধানসভা ভোট পর্যন্ত ঝুঁকে থাকবে, সেই

ইঙ্গিত অনেক আগে থেকেই স্পষ্ট। দল ঘোষণার অনেক আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গে হরকার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই বাড়ছে। শাসকদল ও নেত্রী গুরুং তথা মোর্চাকে একঘরে করে রাখতে হরকাকে যে কাছেই রাখতে চায়, তাও জলের মতো স্বচ্ছ। অন্য দিকে নতুন দল ঘোষণার সময় থেকেই হরকাও স্পষ্ট করে বলছেন, পাহাড়ে উন্নয়নই তাঁর ও তাঁর দলের মূল লক্ষ্য। তার জন্য রাজ্য সরকারকে তাঁরা সঙ্গে পেতে চান। শুধু তা-ই নয়, গুরুং ও মোর্চা হরকা-বিরোধী প্রচারে হরকাকে রাজ্য সরকারের দালাল বলাতেও, প্রতিক্রিয়ায় হরকা জানিয়ে দেন, পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য তিনি রাজ্য সরকারের দালাল হলে লাভ তো পাহাড়বাসীর।

সব দিক ভেবেই হরকাও কিন্তু তাঁর দলের দাবি থেকে পৃথক রাজ্য অর্থাৎ গোর্খাল্যান্ড বিষয়টি সরিয়ে রাখতে পারেননি। বলা ভাল, সরিয়ে রাখতে চানওনি। কারণ, পাহাড়ের রাজনীতিতে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিকে সরিয়ে রেখে কোনও দলই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। হরকা বাহাদুর ছেত্রি বা তাঁর নতুন দল জন আন্দোলন পার্টি এর ব্যতিক্রম ঘটাবে কীভাবে? যদিও দলের কর্মসূচিতে কোথাও নির্দিষ্ট করে গোর্খাল্যান্ড কথাটির উল্লেখ নেই, কিন্তু পৃথক রাজ্য আদায়ের কথা হরকা ও তাঁর দলের অন্দরে খুব স্পষ্টই লক্ষ করা যায়।

হরকা স্পষ্টতই বলেছেন, গায়ের জোরে গোর্খাল্যান্ড বা আলাদা রাজ্য দাবি করা যায় না, বুদ্ধি দিয়ে আদায় করতে হয়। মোর্চা তথা বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা পাহাড়বাসীকে ভুল বুঝিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। সে আন্দোলন ছিল টাকাপয়সা আদায় করার। পৃথক রাজ্য বা গোর্খাল্যান্ড দাবি আদায়ের আন্দোলন আসলে পাহাড়ের এবং পাহাড়বাসীর উন্নয়নের জন্য দাবি আদায়ের আন্দোলন। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, মুখে হরকা পৃথক রাজ্য বা গোর্খাল্যান্ডের কথা না বললেও পাহাড়ের উন্নয়নকে সামনে রেখেই তিনি গোর্খাল্যান্ডের দাবি চালিয়ে যাবেন।

হরকা একাধারে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। তাঁর রাজনৈতিক চাল যে গুরুং কিংবা রোশনদের থেকে অনেক বেশি পরিশীলিত এবং সুকৌশলী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর দাবি আদায়ের আন্দোলন কখনওই ধ্বংসাত্মক অথবা হিংসাত্মক হবে না ঠিকই, কিন্তু তাঁর সুকৌশলী রাজনৈতিক চালেই একদিন পাহাড়ে পৃথক রাজ্যের আন্দোলন গণ-আন্দোলনের চেহারা নেবে। সরকারের সাহায্য ও সমর্থন পেতে হরকা কখনওই শাসকদলকে খেপিয়ে তুলবেন না। তবে পাহাড়ে তাঁর প্রভাব বাড়িয়ে তুলতে হরকা সবসময়ই দাবি আদায়ের পথেই হাঁটবেন।

নি.প্র.

মমতাই পেরেছেন সাইকেল বিলিকে গণকর্মসূচি বানাতে

জলপাইগুড়ি জেলার একটা হাই স্কুল, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। অধিকাংশ স্থানীয় আদিবাসী। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কট্টর সিপিএম। জনপ্রিয়, শিক্ষাদরদি বলে পরিচিত। আকাশের রং পরিবর্তনের সঙ্গে রাজনীতির পোশাকের রং পরিবর্তনের প্রতিযোগিতার হুড়োহুড়ির মধ্যেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের পোশাকের রং পরিবর্তন করেননি। এখনও বিশ্বাস করেন, সিপিএম আবার ঘুরে দাঁড়াবে। এই রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার অভিযোগের মধ্যেও সিপিএমের মিছিলের সামনের সারিতে যোগ দিয়েও পরের দিন তৃণমূলের অফিসের সামনে দিয়ে হেঁটেই স্কুলে আসেন। পার্টি অফিসে যান। আবার সেই পথেই ফিরে আসেন। সিপিএম ক্ষমতায় থাকার সময় সেই সিপিএম অফিস সবসময় জমজমাট এবং নানা প্রত্যাশীর ভিড় অনেক রাত পর্যন্ত গমগম করত। উনি জেলা কমিটির যে পদে ছিলেন, সেখানে এই পদের কমরেডরা তাদের কৌলীন্য বজায় রাখতে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে তাদের গুরুত্বের বিজ্ঞাপন জাহির করলেও এই শিক্ষক একাই যেতেন, একাই আসতেন। বলতেন, মানুষই আমার নিরাপত্তা।

আজ ছবিটা উলটো। আকাশে লালের বিজয়ের আবিরের পরিবর্তে সবুজের ছটা। সিপিএমের সেই ভিড়টা এখন শাসক তৃণমূলের দপ্তর ভবনে। বহু নির্বাচিত পঞ্চায়েত জেলা পরিষদের সদস্য তো বটেই, এমনকি বিধায়কও ক্ষমতার কেন্দ্রে আবর্তিত হবার নিরাপদ যে আশ্রয়ে ৩৪ বছর ধরে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিলেন, তাঁরা সেই অভ্যাসকে শ্রদ্ধা জানাতেই রাজনৈতিক লাল সূর্যের পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সবুজ সূর্যের উদয়ের পর পুরনো কক্ষপথের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন কক্ষপথে আবর্তিত হয়ে কৌলীন্য বজায় রেখেছেন। এই মাস্টারমশাই এখনও দু'-চারজন কমরেডের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় সিপিএম অফিসে রাজনৈতিক প্রদীপ জ্বালাতে আসেন। ফেরার সময় সাবধান করে বলা হয়, একটু সাবধানে যাবেন।

মাস্টারমশাই ফেরার পথে তৃণমূলের অফিসের সামনে এলে মাঝেমধ্যেই দাঁড়ান। অনেকেই তাঁর ছাত্র। বিজয়াতে প্রণাম করে। সিপিএম নেতা হলেই রে রে করে তৃণমূলের 'লুম্পেন' ক্যাডাররা ছুটে আসে— এটা যেমন সত্যি নয়, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে, তেমনি সত্যি নয়, সিপিএম রাজত্বের বিরোধী হলেও আক্রমণের শিকার হতে হত। দেখা যাবে, যে সমস্ত আক্রমণের ঘটনা ঘটছে, তার পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংক্রান্ত নানা পুরনো দ্বন্দ্ব কাজ করছে। তারপর সেটাই রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় প্রলেপ দিয়ে রাজনৈতিক মৃগয়ার জন্য ব্যবহার করে।

সেই শিক্ষকের স্কুলের মাঠে সারি সারি ঝকঝকে নতুন সাইকেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নতুন সমাজকল্যাণ পরিকল্পনায় ছাত্রদের এগুলি বিলি করা হবে। ছাত্ররা ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে সেগুলির উপর পরম মমতায় হাত বোলাচ্ছে। বিলি হবার আগেই এগুলি যেন তাদের হয়ে গিয়েছে। মাঠের বাইরে তাদের বাড়ির লোকেরা ভিড় করেছে। যেন মেলা। ঝালমুড়ি-ফুচকার দোকানও বসে গিয়েছে। নাম হয়ে গিয়েছে মমতার সাইকেল। ভিড়ের নাম হয়ে গিয়েছে মমতার সাইকেল মেলা।

সিপিএমের সদস্য হলেও সরকারি অনুমোদিত স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আসবেন যেমন সরকারি আধিকারিক, তেমনি আসবেন বর্তমানে নির্বাচিত পদে আসীন তৃণমূলের নেতারা। সঙ্গে অতি স্বাভাবিক দাবিতেই তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা। নাম ঘোষণা করবেন প্রধান শিক্ষক। সেই সঙ্গে কিছু বক্তব্য।

এই প্রতিবেদক কোনও একটা কারণে গিয়েছিল সে স্কুলে তার এই পরিচিত প্রধান শিক্ষকের কাছে। তিনি আক্ষেপ করে বললেন, 'আমরা বলতাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি বোঝেন না। চলেন ঝোঁকের মাথায়। অথচ দেখুন, এই সাইকেল বিলি করে তিনি এইসব সরল প্রান্তবাসী পরিবারের মধ্যে কেমন প্রচার চালাবার একটা সহজ সুযোগ নিয়ে বোকা বানিয়ে এদের অধিকাংশকেই বোঝাতে পারছেন, তিনি তাদের এই সাইকেল দিচ্ছেন। কতজন বুঝবে বা জানতে পারবে এটা

জমিদারি প্রথার বিলোপ কংগ্রেস শাসনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিসংস্কার হলেও, এর ফলে উদ্‌বৃত্ত জমি বণ্টনের মাধ্যমে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে কংগ্রেস গ্রামীণ জনজীবনে তার প্রভাবের শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত করার সুযোগের প্রশ্নে কোনও আগ্রহ দেখায়নি।

সরকারি টাকা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত টাকা নয়? সাইকেল দেওয়া হচ্ছে সরকারি অর্থে, প্রচারটা পাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণের কাছে দানবীর রূপে। দেখুন কেমন সস্তা উপায়ে প্রচারের রাস্তা রাজনীতিতে নিয়ে এসেছে।'

রাজনীতিতে তো প্রচারই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও প্রচার করেছেন।

এই প্রসঙ্গে স্যার আইজ্যাক নিউটনকে নিয়ে যে গল্পটা চালু আছে তা বলা যায়।

নিউটনসহ অনেকে বসেছেন টেবিলের আড্ডায়। হঠাৎ একজন প্রস্তাব দিল, কেউ যদি একটা ডিমকে টেবিলের উপর খাড়া করতে পারে, তবে সে একটা শ্যাম্পেনের বোতল উপহার পাবে। সবাই চেষ্টা করলেন একে একে ডিমটাকে টেবিলের উপর খাড়া করে দাঁড় করাতে। যতবারই চেষ্টা করা হল, ততবারই তা গড়িয়ে পড়ল। সবার শেষে এল নিউটনের পালা। স্যার আইজ্যাক নিউটন একটা পিন নিয়ে ডিমের খোলে একটা ছোট্ট ফুটো করে ডিমের ভিতরের কুসুমটা বার করে দিয়ে সেটাকে টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। সবাই তখন চিৎকার করে উঠল, 'এটা তো অত্যন্ত সহজ কাজ হল। এমন হলে তো আমরাও ডিমটাকে টেবিলের উপর দাঁড় করাতে পারতাম।' নিউটন হেসে বললেন, 'পারতেন তো করলেন না কেন? জানা হয়ে গেলে তো সব কাজই সহজ মনে হয়।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাইকেল বিলি নিয়েও এ কথা বলা যায়। আজ যে কথা সিপিএম সদস্য সেই প্রধান শিক্ষকের মনে হচ্ছে যে, এটা খুব সহজেই জনতাকে বোকা বানিয়ে তার প্রতি সমর্থন জানাবার চেষ্টা, সেটা তো তাঁদের আমলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও করতে পারতেন। কেন করলেন না?

বুদ্ধদেববাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালেও কিন্তু কিছু জায়গায় এমন ব্যাপকভাবে না হলেও সাইকেল বিলি করা হয়েছিল। তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই সাইকেল বিলি কর্মসূচিকে যেভাবে গণকর্মসূচিতে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন, বুদ্ধদেববাবুরা তা করতে চাননি বা তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এখানেই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও তার সাফল্য।

এই প্রসঙ্গে মনে করা যায়, বাংলার জমিদারি প্রথা বিলোপের মতন বৈপ্লবিক কর্মসূচি ও তেভাগা আন্দোলন প্রসঙ্গ। জমিদারি প্রথার বিলোপ কংগ্রেস শাসনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিসংস্কার হলেও, এর ফলে উদ্‌বৃত্ত জমি বণ্টনের মাধ্যমে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে কংগ্রেস গ্রামীণ জনজীবনে তার প্রভাবের শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত করার সুযোগের প্রশ্নে কোনও আগ্রহ দেখায়নি। হয়ত তাদের সেই ধারণাই ছিল না এর সুদূরপ্রসারী শুভ ফলের কথা। পরবর্তীকালে এই সুযোগ নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সেই উদ্‌বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে অপারেশন বর্গার নামে বিলি করে গ্রামীণ সমাজে তাদের অপ্রতিহত ক্ষমতাকে স্থাপন করতে পেরেছিল। সাধারণ কৃষকদের মধ্যে একটা ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল, এই জমিদারি প্রথা বিলোপ ও বর্গা চাষ বা বর্গাদারদের প্রজাস্বত্ব দান কমিউনিস্টরাই করেছে। ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। বর্গাদারের প্রজাস্বত্ব প্রদানের কথাটি স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অনেক আগে থাকতেই যাঁরা তুলেছিলেন, তাঁরা কিন্তু কমিউনিস্ট দলের ছিলেন না।

স্বাধীনতার অনেক আগেই ফ্রাউড কমিশনের কাছে একজন অ-কমিউনিস্ট ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য পেশ করে জানিয়েছিলেন, 'বর্গাদাররা ক্ষুব্ধ এবং তাদেরও জমির ক্ষুধা আছে। এরা বিস্ফোরক দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়ে এমন অবস্থায় আছে যে, কোনও উসকানিদাতা ইন্ধন দিলেই এরা একটা বিধ্বংসী কৃষি বিপ্লবের উপাদানে পরিণত করে।'

সে দিন কংগ্রেসের জমিদারি প্রথা বিলোপ এবং ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনে বর্গাদারদের সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি অন্যের জমিতে নির্দিষ্ট শর্তে জমি চাষ করে, সে-ই বর্গাদার। এই নির্দিষ্ট শর্ত বলতে বলা হয়েছিল, ওই চাষের বিনিময়ে ওই জমিতে উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ জমির মালিককে দেবে। আজকে যে উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগ চাষির এবং এক ভাগ জমির মালিকের, সেটাও কিন্তু ছিল ফ্রাউড কমিশনের বক্তব্য।

কৃষিভিত্তিক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ কংগ্রেস নিলেও জনগণের মধ্যে তাদের এই কর্মসূচি আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতাসম্পন্ন হওয়ার কারণে তার ফল কংগ্রেস ভোগ না করে বামফ্রন্ট ভোগ করেছিল। বামফ্রন্ট সেই সুফলকে কেন ধরে রাখতে পারল না? সেটা অবশ্য এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

বামফ্রন্ট যেখানে ক্ষমতার দম্ভে তাদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নিয়ে, জনগণের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মনে করে, অতীতের সুকৃতির সুদে সব তাদের পক্ষে আছে বলে ধরে নিয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখান থেকে শুরু করে জনতার মধ্যে তাঁর প্রকল্পগুলিকে সরাসরি নিয়ে যেতে চাইছেন।

শিলিগুড়ি শহরসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সাইকেল বিলিকে কেন্দ্র করে যে অবরোধ হচ্ছে, তাতে কিন্তু তৃণমূলেরই অসুবিধা হচ্ছে। যারা এই সাইকেল বিলির কথা জানত না, তারাও কিন্তু জেনে যাচ্ছে সরকারের নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাইকেল বিতরণের কথা। উভয় পক্ষের ভাবনা ও কর্মসূচি দেখে মনে হয়, সাইকেল বিলির চাকাও আবর্তিত হচ্ছে রাজনৈতিক রথের চাকার কাজে। বিজয়ী রথের সারথি রূপে মমতাই বরণীয় হলেন।

সৌমেন নাগ

জনগণনায় প্রকৃত ছিটবাসীরাই পড়েছে বাদ ঠাঁই পেয়েছে জাল পরিচয়পত্রের বাংলাদেশিরা

ছিট বিনিময়ে আসলে জাল ভারতীয়রাই হয়েছে লাভবান। এটা হয়েছে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি এবং ভূমিদস্যুদের গভীর ষড়যন্ত্রে। প্রকৃত রায়তদের উৎখাত করে বাইরে থেকে আসা মানুষদের ছিটবাসী ভারতীয় হিসেবে প্রতিপন্ন করে আদমশুমারিতে নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রশাসন মিত্রতার সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে বাংলাদেশ প্রশাসনের কৌশলের কাছে এক প্রকার হার মানতে বাধ্য হয়েছে। জনগণনা ও জাল পরিচয়পত্র নিয়ে **দশম পর্ব**।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে বলরাম বর্মন ও রফিকুল ইসলামের স্বাক্ষর করা দরখাস্তে উল্লেখ রয়েছে, 'আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ ভারতীয় ছিটমহলগুলির অধিবাসীবৃন্দ দশকের পর দশক ধরে এক চরম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করে চলেছি। আমাদের না আছে ভোটাধিকার, না আছে রেশন কার্ড, না আছে ভারতের বৈধ নাগরিকত্ব। অথচ আমরা জানি যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন একদা ব্রিটিশ করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহারের মহারাজার প্রজা এবং কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তির মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকত্বের অধিকারী। অথচ অদৃষ্টের পরিহাস, কোচবিহার রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে সম্পূর্ণরূপে যোগদানের (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯) ৬৪ বছর পরও আমরা রাষ্ট্রহীন নাগরিকত্বের যন্ত্রণা বহন করে চলেছি।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ ভারতীয় ছিটমহলগুলি আজ প্রকৃত অর্থে জঙ্গলের রাজত্বে পর্যবসিত। মৌলবাদী শক্তির মদতে বাংলাদেশের জমি লুটেরাদের বর্বরোচিত অত্যাচারে প্রকৃত ছিটবাসীদের (যাদের কিনা কোচবিহার মহারাজার প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত জমির দলিল ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র রয়েছে) একটা বড় অংশই জীবন বাঁচাতে জমিজিরেত, ভূসম্পত্তি ফেলে রেখে বিভিন্ন সময়কালে ভারতের মূল ভূখণ্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা উদ্বাস্তুর মতো জীবনযাপন করে চলেছেন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের জমি লুটেরাদের দল ছিটমহলগুলি দখল করে ছিট বিনিময়ের সুযোগ নিতে অতি সম্প্রতি তৎপর হয়ে উঠেছে। ২০১১ সালের জনগণনায় অধিকাংশ ছিটমহলের ক্ষেত্রে এই সকল বাংলাদেশি দখলদারই নিজেদের জাল ভারতীয় পরিচয়ের মাধ্যমে নাম তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি। অথচ আমরা যারা উত্তরাধিকারসূত্রে (কোচবিহার রাজ্যের প্রজা হিসেবে) ভারতীয় ছিটমহলগুলির প্রকৃত নাগরিক, তারা জনগণনা প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ব্রাত্য হয়ে অনিশ্চিত জীবনযাপন করে চলেছি।'

২০১১ সালে অনুষ্ঠিত জনগণনা সম্পর্কে ছিটবাসীদের দু'টি সংগঠনের এহেন মনোভাব এবং ছিটমহলগুলির প্রকৃত স্বরূপ রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় বিচারপতিদের যে বিস্মিত করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, এমনিতেই বাংলার উত্তর সীমান্তের এই জটিল সমস্যা সম্পর্কে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার সুশীলসমাজ সেভাবে অবগত নয়। ছিটমহলের ছিটবাসীদের যন্ত্রণা সেভাবে কখনওই কলকাতার বিদ্বজ্জনদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। মাঝেমধ্যে সংবাদপত্রে ছিটমহল সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকেছে পত্রিকার উত্তরবঙ্গ সংস্করণে। ফলে ছিটবাসীদের যন্ত্রণার কথা সেভাবে কলকাতায় থাকা বাংলার অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। আর রাজনৈতিক মহলেও এই প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে ভাববার সময় কোথায়? এসবই হয়ত ব্রাত্য ছিটবাসীদের ভাগ্যের পরিহাস। যার ফলস্বরূপ ছিটমহল সমস্যা সেভাবে কোনও দিনই বাংলার সমাজজীবনে ঢেউ তুলতে পারেনি। তাই সমাজও আলোড়িত হয়নি। তার কারণেই রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় বিচারপতিরা ছিটবাসীদের মুখে তাঁদের যন্ত্রণার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান।

ভারতীয় ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল ও ছিটমহল পিপলস কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে দায়ের করা দরখাস্তে তাঁরা এও উল্লেখ করেন, '১৯৯২ সালে যখন তিন বিঘা করিডরের মাধ্যমে বাংলাদেশের দু'টি বৃহত্তম ছিটমহল আঙ্গারপোতা ও দহগ্রামকে মূল ভূখণ্ডে সংযুক্ত করা হল, তখন আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে, ভারতের দু'টি ছিটগুচ্ছকে (কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা থানার অধীনস্থ বাঁশকাটা ছিটগুচ্ছ এবং হলদিবাড়ি থানার অধীনস্থ শালবাড়ি, নটকটকা, কাজলদিঘি, বেউলাডাঙা, নাজিরগঞ্জ ইত্যাদি ছিটগুচ্ছ) যথাক্রমে জোংরা করিডর এবং আড়াই বিঘা বা দেড় বিঘা করিডরের মাধ্যমে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে ছিটমহল সমস্যার সমাধান করতে সরকার উদ্যোগী হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমরা দেখলাম যে, ১০ হাজার একরেরও বেশি ভারতীয় ভূখণ্ডের ক্ষতি স্বীকার করে ১১১টি ভারতীয় ছিটের সঙ্গে ৫১টি বাংলাদেশি ছিটের বিনিময় হতে চলেছে।'

ছিটবাসীদের দু'টি সংগঠনই এই পর্বে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে— এক, যে প্রক্রিয়ায় ছিট সমস্যার সমাধান হতে চলেছে, তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ কী? দুই, প্রকৃত ছিটবাসী হয়েও আমরা কি তবে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চনার শিকার হব? নাকি আমাদের ছিট জনগণনায় অন্তর্ভুক্ত করে তবেই এই সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে?

শুধু প্রশ্নই নয়, দরখাস্তের প্রায় শেষ পর্বে তাঁদের সকরুণ প্রার্থনাটিও উল্লেখযোগ্য— 'ছিটমহলের ভূমি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান একরকম অনিশ্চিত। সেই দোলাচলে আমাদেরকে না ফেলে অতীত দিনের অর্থাৎ রাজ আমলের দলিল-দস্তাবেজকেই প্রামাণ্য নথি হিসেবে ধরা হোক। আর ওই নথিগুলির ভিত্তিতে আমাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানে আপনি সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন। প্রকৃত ভারতীয় ছিটবাসীর প্রত্যেককে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিচয়পত্র প্রদান করুন, তাঁদের

ভারতীয় প্রশাসন মিত্রতার সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে বাংলাদেশ প্রশাসনের কৌশলের কাছে এক প্রকার হার মানতে বাধ্য হয়েছে। ছিটবাসীদের সংগঠন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের বিচারপতিদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে তাঁদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে।

পূর্ণ ভারতীয় নাগরিক পরিষেবার আওতায় আনুন, মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ দিন এবং অবাধে ছিটমহলগুলিতে যাতায়াতের সুযোগ করে দিন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশি দখলদারদের হাত থেকে ভারতীয় ছিটগুলিকে উদ্ধার করে প্রকৃত রায়তদের হাতে তুলে দিন। ছিটবাসীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আপনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন।'

ছিটবাসীরা পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান সমীপে যে কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছেন তা হল, ২০১১ সালের জনগণনায় প্রকৃত ছিটবাসীরাই বাদ পড়েছে, আর তাদের জায়গা দখল করে জাল ভারতীয় পরিচয়পত্রে বাংলাদেশি দখলদাররাই তাদের অবস্থান মজবুত করেছে। ছিট বিনিময়ে আসলে জাল ভারতীয়রাই হয়েছে লাভবান। আর এটা করা হয়েছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি এবং ভুমিদস্যুরা গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত রায়তদের উৎখাত করে সেই জায়গায় বাইরের থেকে আসা মানুষদের ঠাঁই দিয়েছে। পাশাপাশি তাদেরকে ছিটবাসী ভারতীয় হিসেবে প্রতিপন্ন করে আদমশুমারিতে নাম নথিভুক্ত করাতেও সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রশাসন মিত্রতার সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে বাংলাদেশ প্রশাসনের কৌশলের কাছে এক প্রকার হার মানতে বাধ্য হয়েছে। ছিটবাসীদের সংগঠন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের বিচারপতিদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে তাঁদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে। হয়ত তাঁরা ভেবেছেন, বারংবার রাষ্ট্রনায়কদের কাছে আবেদন করেও যখন কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, তখন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মারফত যদি কোনও সুবিচার পাওয়া যায়।

কোচবিহার সার্কিট হাউসে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের শুনানিপর্বে চেয়ারম্যান মাননীয় বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় ছিটবাসী বলরাম বর্মনের কাছে নির্দিষ্ট করে বহু বিষয় জানতে চান। কমিশনের অপর সদস্য বিচারপতি নারায়ণচন্দ্র শীল মাঝেমধ্যে বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্নও করেন। বলরামবাবুরা যথাসম্ভব সেগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। সীমান্তপারের বাঁশকাটা থেকে কোচবিহারের সার্কিট হাউসে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের শুনানিতে তামাম ছিটবাসীর দুর্দশার কথা পৌঁছে দেওয়া ছিটমহল আন্দোলনে এক অন্য মাত্রা যোগ করে।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন ছিটবাসীদের পিটিশনের শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তার অংশবিশেষ উল্লেখ করা হল। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও সদস্য বিচারপতি এন সি শীল স্বাক্ষরিত File No. 6/BHRC/COM/2013-14, Date : 09.09.2013 নং-এর প্রতিবেদনে উল্লিখিত বক্তব্যটি হল—

'One Balaram along with others has appeared today before the commission sitting at Coochbehar along with him Mr. Debabrata Chaki, a Journalist is also present.

The commission has heard all of them and gone through the petition filed by Sri Barman on behalf of 'Bharatiya Chhitmahal Oikya O Chhitmahal Peoples Committee'.

In fact, in the petition, the petitioner has described the injustice which are continued on them for being the Indian Chhitmahal situated in Bangladesh.

The Commission has examined Sri Barman and his evidence was recorded. Let it be kept with the record.

After having considered the petition, it appears that the matter is an international issue which is the subject matter of the Central Government. Accordingly, the Commission refers this petition to the National Human Rights Commission for consideration.

Accordingly, petition is hereby disposed of.'

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে প্রেরণ করলেও পরবর্তীতে তা যে ফাইলের ভিতর নিশ্চিত নিদ্রায় মগ্ন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, এর পরবর্তীতে বহু ঘটনাপ্রবাহে বারংবার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও তা বিচারের মাপকাঠিতে সমীহ আদায় করতে সক্ষম হয়নি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ২০১৪ সালের ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে একের পর এক ঘটনাপ্রবাহ। অকুস্থল ১৫০ দাশিয়ার ছড়া ছিটমহল। দিনহাটা থানার অধীনস্থ এই ছিটমহলটির অবস্থান বাংলাদেশের কুঁড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার অভ্যন্তরে।

(ক্রমশ)

দেবব্রত চাকী

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

পটলরাম পর্যটক যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচটাওয়ারে উঠে বসন্তপঞ্চম রাগে গান ধরল—
শতরঞ্জ কা মন্ত্রী লাও
ইঞ্জিরি মে নাম দাও
পহেলে এক ড্রপ বসাও
আশ্চরিয় নাম পাও।
গান শুনে পরিযায়ী পাখির দল ঘাবড়ে গিয়ে পাকিস্তানে চলে গেলেও আমি কিন্তু এবার বুঝে গেছি যে পটলোক্ত জায়গাটার নাম কী। আপনিও বুঝে গিয়েছেন, জানি।

২

ফেসবুকে সে দিন দেখলেম এই পোস্টটা— 'ঘি-এর বহুবচনকে দেখি শহরের গায়ে আর শহরের মধ্যে দুই— পাঁচে দেখি দড়ি। খুঁজলে বাড়িতে ওল পেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে আমি কোথায় থাকি?' কোথায় থাকে জানার জন্য পোস্টকারীকে মেসেজ করেছিলেম। কিন্তু হায়! কাগজে পড়লেম তাকে নাকি পেয়াদা এসে পাকড়ে নিয়ে গিয়েছে। এখন থাকে কোথায় জানতে পারলে সমবেদনা জানাতে যেতেম একবার।
ধাঁধাটা নির্ঘাত বুঝে গিয়েছেন আপনি!

৩

মালদার নাম শুনেছেন তো? আরে সেই মালদা! ফারাক্কা ব্রিজের আগে! হ্যাঁ, সেই মালদাই নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ডুয়ার্সে। ওঁর জামাইয়ের কথাই বলছি। কী নাম জামাইয়ের, মনে আছে দাদা?

গতবারের উত্তর— ১) জর্দা নদী, ২) মেটেলি

প্রথম সঠিক উত্তরদাতা— **জয়তী রায়**, তুরতুরি

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিকের বিজ্ঞান বিষয়ে জরুরি পরামর্শ

পরীক্ষার ঠিক আগের দিনগুলিতে রসায়ন, জীববিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যা— এই বিষয়গুলির কোন কোন দিকে বেশি নজর দেওয়া দরকার তা স্নায়ুর চাপে অনেক সময় গুলিয়ে যায়। অথচ দুশ্চিন্তায় কাবু না হয়ে মাথা ঠান্ডা রাখলে সব সময়ই ভাল ফল পাওয়া যায়। হাতে সময় কম ঠিকই, তবে ডুয়ার্সের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের শেষ মুহূর্তের পরামর্শগুলি অবশ্যই ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক হবে।

রসায়ন

২০১৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়ের যেসব দিকে নজর দেওয়া দরকার—

১) সব অধ্যায় খুঁটিয়ে পড়তে হবে, না হলে সব অবজেক্টিভ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না।

২) Physical Part-এর সমস্ত Numerical Problem চর্চা করতে হবে, কারণ এই Part-এর বেশির ভাগই অঙ্কের প্রশ্ন থাকবে।

৩) বিভিন্ন সূত্র ও সমীকরণ নির্ভুলভাবে লেখার চর্চা করতে হবে। সামান্য শব্দ বা চিহ্নের পার্থক্যে সম্পূর্ণ উত্তরটি ভুল হয়ে যেতে পারে।

৪) p block elements এবং d ও f block elements-এর তুলনামূলক আলোচনাগুলি ভাল করে পড়তে হবে। এতে বিভিন্ন 'ব্যাখ্যা করো' জাতীয় প্রশ্নের উত্তর করতে সুবিধা হবে।

৫) প্রতিটি Inorganic Chapter-এর গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়ার সমীকরণগুলি আলাদাভাবে লিখে মুখস্থ করা উচিত।

৬) কয়েকটি বিশেষ যৌগ, যেমন— ফসফরাসের অক্সি অ্যাসিড, জেননের ফ্লুয়োরাইড ও অক্সিফ্লুয়োরাইড যৌগ ইত্যাদির গঠন অঙ্কন চর্চা করতে হবে।

৭) d ও f ব্লক মৌলগুলির ইলেকট্রন বিন্যাস ও ওই সংক্রান্ত প্রশ্নে গুরুত্ব দিতে হবে।

৮) জটিল যৌগের IUPAC নাম, d-d transfer, crystal field splitting সম্পর্কিত প্রশ্নগুলিতে জোর দিতে হবে।

৯) Organic-এর Conversion-গুলিতে জোর দেওয়ার পাশাপাশি সমস্ত Name reaction সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে।

১০) বিক্রিয়া বা A, B, C, D শনাক্তকরণ জাতীয় প্রশ্নের যৌগটির সঠিক সংকেতের পাশাপাশি সঠিক নাম উল্লেখ করা জরুরি।

১১) পরীক্ষার সম্পূর্ণ ৮০ নম্বরের উত্তর দেওয়া ভালো নম্বর তুলতে আবশ্যিক। তাই কোনও অধ্যায়ই বাদ দিয়ে পড়া যাবে না।

কারণ, বেশ কিছু প্রশ্নের কোনও বিকল্প প্রশ্ন থাকে না। এ ছাড়া Mock Test-এর দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

নবেন্দু সরকার

জীববিদ্যা

১) যেহেতু MCQ রয়েছে, প্রতিটি Chapter খুঁটিয়ে পড়তে হবে।

২) Genetics ও Evolution, Reproduction, Biotechnology-তে প্রচুর বোঝার বিষয় রয়েছে। এগুলিতে অবশ্যই জোর দিতে হবে।

৩) চিত্রসহ Antibody-র গঠন, DNA Replication, DNA Translation, শুক্রাশয়ের গঠন প্রভৃতি বিষয়ে বিশদে জানতে হবে।

৪) ২ ও ৩ নম্বর মিলিয়ে মোট ১৪টি প্রশ্ন রয়েছে। এগুলো to the point অবশ্যই হতে হবে।

সুজিতকুমার চন্দ

পদার্থবিদ্যা

উচ্চমাধ্যমিকে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে ভাল নম্বর পেতে হলে যা সবচেয়ে বেশি জরুরি তা হল, সম্পূর্ণ পাঠ্যবইটি খুঁটিয়ে পড়া এবং প্রতিটি ইউনিটের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা, যা তোমরা ইতিমধ্যেই অনেকটাই সেরে ফেলেছ বলে আমি আশা করি। এই মুহূর্তে পরীক্ষা ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে। তাই এই স্বল্প সময়ের প্রাক্-প্রস্তুতিতে এবং প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে তোমাদের যা করণীয় তা সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হল—

১) পরীক্ষার আগে অবশিষ্ট দিনগুলিকে মোট দশটি ইউনিটের Weightage অনুযায়ী ভাগ করে নিয়ে প্রতি ইউনিটের সারসংক্ষেপগুলি দেখে নাও। এর পর গাণিতিক ফর্মুলা, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম— এগুলি লিখে অভ্যাস করো।

২) এর পর দেখো কোন কোন প্রশ্নের উত্তর এখনও তোমার ভাল করে তৈরি হয়নি, সেগুলি পড়ে লেখার অভ্যাস করো।

৩) পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পেয়েই সমস্ত প্রশ্নপত্রটি ভাল করে পড়ে চিহ্নিত করো। এর পর উত্তর লেখা শুরু করবে সবচেয়ে সহজ প্রশ্ন দিয়ে, যা তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে এবং পরীক্ষার হলে যা অত্যন্ত জরুরি।

৪) গাণিতিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি প্রাধান্য দেবে। একান্ত নিরুপায় হলে তবেই ব্যাখ্যাধর্মী প্রশ্ন উত্তর করার চেষ্টা করবে।

৫) যে সমস্ত উত্তরে লেখচিত্র বা ডায়াগ্রাম দেওয়ার সুযোগ থাকবে, সেখানে প্রশ্নে না চাইলেও সময়ের প্রতুলতা অনুযায়ী সুযোগটি হাতছাড়া না করাই ভাল।

বিক্রম দাস

বাড়িতে বসে 'এখন ডুয়ার্স' চাইছেন?

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার শহরে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সেক্ষেত্রে যিনি আপনাকে পত্রিকা পৌঁছে দেবেন তাঁর হাতে পত্রিকার দাম দিয়ে দিতে হবে, নতুবা পরের সংখ্যাটি পৌঁছনো সম্ভব হবে না। এককালীন ২৫০ টাকা পাঠিয়েও এক বছরের সবকটি সংখ্যা বাড়িতে বসে পেতে পারেন। A/C Payee Cheque 'Ekhonduars' নামে কিংবা ক্যাশেও টাকা পাঠানো যায়। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন দেবজ্যোতিকে ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।

পুরসভার দাবিতে সরব ফালাকাটা টাউন ক্লাব

সাতের দশকে ফালাকাটা টাউন ক্লাবে ছিলেন একদল কৃতী ফুটবলার। সেই সময় এই ক্লাবের উদ্যোগেই সংগঠিত হত ডুয়ার্সের অন্যতম ফুটবল টুর্নামেন্ট। এনবিএসটিসি, বিএমএফ-সহ রাজ্যের বহু নামীদামি ফুটবল দল অংশ নিত। সেই স্বর্ণালি দিনগুলি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ ফের নেওয়া হয়েছে। বিদেশ বসু, কম্পটন দত্ত, ভাস্কর ব্যানার্জি, আকবর, সুরজিৎ সেনগুপ্তর মতো ফুটবলার টাউন ক্লাবের মাঠে খেলেছেন। এই ক্লাবের মধ্যে রয়েছে ইনডোর স্টেডিয়াম। ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় এখানে নিয়মিত চলে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ। ব্যাডমিন্টন খেলা হয় নিয়মিত। বাদ নেই টেবিল টেনিসও। এ বছর স্টেট ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ্ব ১৩, ১৫, ১৭ ও ১৯ বিভাগের পুরুষ ও মহিলা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হয় ফালাকাটা টাউন ক্লাবের পরিচালনায়। ক্রীড়া ছাড়াও সামাজিক কাজের অঙ্গ হিসেবে নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবির, দুঃস্থদের বস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য করা হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে।

ডুয়ার্সের অন্যতম জনপদ ফালাকাটা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাসহ শিলিগুড়ির সঙ্গে সংযোগের পথ। ডুয়ার্সের গুরুত্বপূর্ণ এই জনপদ এখনও পুরসভার তকমা পায়নি। সে ক্ষেত্রে সরকারিভাবে ফালাকাটা শহর নয়। কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ব্লকে ১৯৫৪ সালে গড়ে উঠেছিল টাউন ক্লাব। পরিবর্তনের রাজ্যে জলপাইগুড়ি ভেঙে রাজ্যের ২০তম জেলা হিসেবে ঘোষিত হয় আলিপুরদুয়ার। বর্তমানে ওই জেলারই অন্তর্ভুক্ত ব্লক ফালাকাটা।

ফালাকাটায় এখনও কোনও স্টেডিয়াম নেই, তবে ফালাকাটা টাউন ক্লাবের নিজস্ব খেলার মাঠ রয়েছে। সময়ের বিবর্তনে ওই মাঠটিকেই স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন ক্লাবের সম্পাদক বিমল লোধ রায়। সে ক্ষেত্রে মাঠ রক্ষার দায়িত্ব হাতছাড়া হতেই পারে। হতে পারে মাঠের মালিকানা বদল। ক্লাব সম্পাদকের বক্তব্য, যা-ই হোক, সবটাই হবে ফালাকাটার উন্নয়নে। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জনে রাজি এই ক্লাব। ফালাকাটাকে ব্লক থেকে মহকুমায় উন্নীত করা এবং পুরসভা করার দাবি নিয়ে নাগরিক মঞ্চ গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে এই ক্লাব। সভাপতি রণেশ তালুকদার জানান, আমরা চাই ফালাকাটার সার্বিক উন্নয়ন। এই লক্ষ্যে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

পাড়া বা এলাকাভিত্তিক কোনও ক্লাব নয় ফালাকাটা টাউন ক্লাব। কোনও সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসব পরিচালিত হয় না এই ক্লাবের পক্ষ থেকে। তবে বর্ষবরণ, বিজয়া সম্মিলনী হয়ে থাকে এদের উদ্যোগে। ছয় দশক আগে যে ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন অগ্রজরা, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প নিয়েছে এই প্রজন্ম।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

কীর্তন গানের প্রতিযোগিতা

দুরামারি ইয়াং অ্যাসোসিয়েশন ও সুকান্ত জন্মগ্রন্থাগার তাদের ৩১তম বর্ষপূর্তি উৎসবে আয়োজন করেছিল জমজমাট কীর্তন গানের প্রতিযোগিতা। গ্রামের অসংখ্য

ছোট-বড় কীর্তনের দল মঞ্চ মাতিয়ে গাইল নানান পদ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে এমন অন্তর্ভুক্তি সকলের বাহবা আদায় করে নিল। ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি দুরামারি চন্দ্রকান্ত উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নানান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বন্ধুর কাছে পাঁচটি এসএমএস লেখা, দু'মিনিটে বিখ্যাত মানুষের জীবনী বলা, দূষণ নিয়ে ভাষণ, ছোটদের কণ্ঠে বড়দের গান, স্বদেশ বা সমাজ নিয়ে গান, বৃষ্টি বা বর্ষা বিষয়ক গান, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর প্রতিযোগী অংশ নেয়। খুদেরা সাজে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্র। ছিল উত্তরের মাটির গান ভাওয়াইয়া গানের প্রতিযোগিতা।

উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপিকা ওরাওঁ, উপপুরপ্রধান অরূপ দে, অধ্যাপক নির্মল রায় প্রমুখ। ডুয়ার্সের সাংস্কৃতিক জগতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিতে কৃতী সম্মান ২০১৬ স্মারক তুলে দেওয়া হয় গয়েরকাটার সংস্কৃতিকর্মী জীবন সরকার ও বানারহাটের প্রলয় দে সরকারের হাতে।

সংগীতানুষ্ঠানে শ্রোতাদের মোহিত করেন গৌরী মিত্র। আয়োজক সংস্থার পক্ষে বৃন্দাবন বারুই বলেন, সুস্থ সংস্কৃতির প্রচারে ও প্রসারে তাঁরা আন্তরিকভাবে প্রতি বছর এই অনুষ্ঠান করে থাকেন।

কথায় কথায় কিছুক্ষণ

মঞ্চে বিশাল পর্দায় কখনও ডুয়ার্সের জনপদ, লোকনৃত্যের ছবি, আর সামনে বসে আছেন একঝাঁক গুণী মানুষ। অনুষ্ঠানের শিরোনাম 'কথায় কথায় কিছুক্ষণ'। সংস্কৃতি, সমাজ, সময় ইত্যাদি নিয়ে রীতিমতো জমজমাট তর্কবিতর্ক। নানান প্রশ্নের উত্তরে উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক ড. দীপককুমার রায়, লেখক অমিত কুমার দে, লোকশিল্পী জিতেন গীদাল প্রমুখ। উঠে এল ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকার নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে নানা জানা-অজানা তথ্য। আয়োজক সংস্থা একটি প্রত্যন্ত গ্রাম রানিরহাটের ইউনাইটেড কালচারাল ক্লাব।

নিজস্ব প্রতিনিধি

নিজস্ব অনুভব ও দর্শন

‘অন্ধকার ঘনিয়ে এলে নীরব আত্মসমর্পণ/ দরজা তখনও উন্মুক্ত থাকে’— লিখেছেন ড. গৌরমোহন রায়। উত্তরের এই কৃতী গবেষক, সাহিত্য সমালোচক যখন কবিতার বই প্রকাশ করেন, তখন তরাই-ডুয়ার্সের সাহিত্যমণ্ডলে আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য সুবিদিত। প্রান্তবেলায় তাঁর কবিতার বই

পাঠকের কাছে তুলে ধরে এক মরমি মানুষকে। যে কবিতায় পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ে তাঁর কিশোরবেলা, দুঃখবোধের কথা, একাকিত্ব, তাঁর নিজস্ব অনুভব ও দর্শন। তিনি যেন একা একাই বলে ফেলেন, ‘আজকাল আকাশে আর রোদ ওঠে না/ যেখানে শুধুই বর্ষার মেঘ’। চিরন্তনী ভাবনায় বলে ওঠেন, ‘সাগরে মেশার আগে কিছুকাল নদী হয়ে থাকা’। মনে পড়ে যায় টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা। কবি অনুভব করেন— এক সময় ‘মানুষের মুখ ছিল মানুষের মতো/ সেই মুখ তুমি খুঁজে পাবে না তো আর।’ চারদিকে জীবন্ত রোবটের মিছিল। এরই মধ্যে তাঁর কাছে ভেসে আসে তিতিরের দিনগুলি, সুগন্ধি লেবুপাতার ঘ্রাণ। স্নিগ্ধ তরুণীর মতো কোমল সবুজ ঘাসের ডাক। শেষ কবিতায় ড. রায় বলেন— ‘মনে হয়, এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলি/ জীবনের সব গোপন কথা/ হৃদয়-কন্দরের গোপন অন্ধকারে/ যারা রয়েছে সুপ্ত।’ সত্যিই কি কোনও কবি বলে উঠতে পেরেছেন তাঁর সব কথা?

বিষণ্ণ বাতাসে—একাকী/ড. গৌরমোহন রায়/মূল্য ৩০ টাকা/স্বপ্রকাশিত

নির্ভেজাল মায়ায় জড়ানো

ভেজা ভেজা একগুচ্ছ শব্দ; যেন অগোছালো, কিন্তু কোথাও এক সুতোয় বাঁধা। স্মৃতি দাসের নতুন কবিতার বই সত্যিই কিছু মুহূর্তের জন্য ভিজিয়ে দেয়। আমরা পড়ি তাঁর প্রিয় চেয়ারের গল্প— যার ‘বেশি কৌশল নেই/ আনন্দ বিষাদে/ পঁচিশটি ঋতু’, যার সঙ্গে কবি কাটিয়েছেন। নস্টালজিয়া তাঁর কবিতায় কুয়াশার মতো জড়িয়ে থাকে। তাই ‘গলি থেকে রোদ মুছে গেলে উলটো দিক থেকে মৃদু আলো জড়িয়ে ঢোকে’ ফেলে-আসা ‘সরল বিকেল’। তিস্তা নদীর কথা কী সুন্দর করে বলেন— ‘পাহাড় সংবাদে দুকূল ভরিয়ে/ প্রগল্‌ভ-চলা জনপদ ঘুরে’। কী দারুণ ছবি— ‘এখনও প্রতিটি সন্ধ্যায় শ্রবণা অনুরাধা

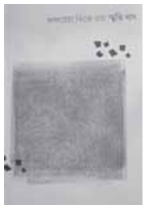

কৃত্তিকা/ জলসা বসায় পাহাড়চুড়োয়’। ‘জঙ্গলরাতের সবুজ অন্ধকার’ কবিকে গল্প শোনায় ‘অশরীরী ধাঁচে’, ‘কোনও এক প্রাজ্ঞ বট যেন স্বপ্নমাখা ডানা মেলে শাখাপ্রশাখায় সরল সবুজে কাছে টানে’। এক নির্ভেজাল মায়া কবিতাগুলোর গা-জড়ানো। কবি একান্তে বলে ফেলেন— ‘গীতবিতানের মাঝে ভীষণ গোপনে/ যদি কাছে থাকে/ তার নীরব ঠিকানা...’। সংসার ঘুমিয়ে পড়লে তিনি একে একে জানালার পাল্লা খুলে দেন, ধীরে ধীরে খোলেন শাড়ির আঁচল।

অক্ষরেরা ভিজে যায়/স্মৃতি দাস/পাঠক/মূল্য ৮০ টাকা

অন্য হিমালয়ের রূপ বর্ণনা

আক্ষরিক অর্থেই এটি একটি গবেষণামূলক বই। লেখক-সাহিত্যিক জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তীকে আমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত, এখানে তিনি অন্যভাবে উপস্থিত হয়েছেন। এখানে তিনি একজন গবেষক। হিমালয় ভ্রমণ আর তার প্রাচীনত্ব লেখককে আকৃষ্ট করেছে। মানুষের জীবনে ভ্রমণ ও ভ্রমণ সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এগিয়ে গিয়েছেন সেই প্রাচীনত্বের পথে। মহাভারতের শেষ পর্বে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থানের যে দীর্ঘ যাত্রাপথ বর্ণিত হয়েছে, লেখক তাঁর রচনায় সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হিমালয়ের রূপ বর্ণনা করেছেন। মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে তিনি পাঠকের কাছে দেবতাত্মা হিমালয়ের রূপ ও মহিমা তুলে ধরেছেন। হিমালয় নিয়ে যুগে যুগে সাধারণ মানুষের আকর্ষণ, শৃঙ্গ স্পর্শ করার নেশা কীভাবে মানুষকে ছুটিয়ে এনেছে তা দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন শুধুমাত্র তীর্থযাত্রী নয়, সাধারণ ভ্রমণপিপাসুদের কাছে ওই পাহাড় কতখানি আকর্ষণের ও ভালবাসার স্থান। এই প্রসঙ্গে তিনি ইন্দিরা গান্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন।

কোন বইটি কী উদ্দেশ্যে লেখা তা বুঝতে এবং আলোচনার সুবিধার্থে লেখক ভ্রমণ সাহিত্যগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করে প্রতিটি বিভাগের সাহিত্য আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গবেষণাধর্মী রচনা হলেও তাঁর লেখা নীরস আলোচনার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। প্রতিটি সাহিত্য আলোচনায় তাঁর নিজস্ব ভাবনা, সাহিত্যবোধ আলোচনাকে অনন্যসাধারণ করেছে।

হিমালয়কেন্দ্রিক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য/ ড. জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী/বইওয়ালা/মূল্য ২৫০

পত্রপত্রিকা

প্রবাহ তিস্তা তোর্সা— ড. কৃষ্ণ দেব সম্পাদিত ধূপগুড়ি থেকে প্রকাশিত এই সংখ্যাটি যথারীতি তার মান বজায় রেখেছে। এই সংকলনে দর্পণে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির কথা লিখেছেন ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, রাজবংশী সমাজ সংগঠন ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা সম্পর্কে লিখেছেন জ্যোতির্ময় রায়, জলপাইগুড়ির স্থাননাম নিয়ে লিখেছেন গৌতমকুমার দাস; এ ছাড়াও মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন অর্ণব সেন, বাসুদেব দাস। শুভময় সরকার, এথেনা মজুমদার, রম্যাণী গোস্বামী, সাগরিকা রায় প্রমুখ ১০ জনের ছোটগল্প ঋদ্ধ করেছে এই সংখ্যাটিকে। অমিত কুমার দে-র ১০০ পঙ্‌ক্তির দীর্ঘ কবিতা ‘মাষাণের উপাখ্যান’-এ উঠে এসেছে উত্তরের লোকায়ত জীবন। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সরকার, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, কঙ্কণ নন্দী, নিত্য মালাকার, তনুশ্রী পাল, সুবীর সরকার প্রমুখ।

উত্তর আকাশ— ওপার বাংলার সরোজ দেব এবং এপার বাংলার শুভাশিস দাসের সম্পাদনায় ঝকঝকে কবিতার কাগজ ‘উত্তর আকাশ’ হাতে নিলেই মন ভাল হয়ে যায়। দুই বাংলার একঝাঁক কবির পরিচিতিসহ একগুচ্ছ কবিতা আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইবনে সিরাজ লিখেছেন, ‘চারদিকে অন্ধকার ওত পেতে আছে/ ফেরার হয়েছে সব আল/ কবিতা লেখার চেয়ে এ দেশে বরং/ বেশ্যার দালাল হওয়া ভাল।’ তনুশ্রী পাল লেখেন, ‘এইসব ঘন নীল ছায়ার মলাটে/ খণ্ড খণ্ড চকমকি সমাদরে রাখি/ মাঝে মাঝে জল ঢালি/ মাঝে মাঝে ওম/ অঙ্কুরিত হই ক্রমে আমির ভিতর।’ এমনি অনেক ভাল পঙ্‌ক্তি কবিতার কাছে নিয়ে যায় পাঠককে। পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ পেলে কবিতার মরমি পাঠক উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে।

সৃজন বিশ্বাস

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর জীবন ধারাভাষ্যে দলীয় রাজনীতি বা ব্যক্তিদের কথা অগ্রাধিকার পায়নি মোটেও। জীবন ধারাপাতে যখন যেখানে ঠেকতে হয়েছে, যাদের সঙ্গে দিন-প্রতিদিনের খুঁটিনাটি ভাগ করে নিতে হয়েছে, অতি সাধারণ হলেও সেইসব মাঠঘাট, জমিজায়গা, মানুষজনই তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘটনা থেকে শুরু করে ব্যক্তিকথায় একাধারে যেমন আশ্চর্য হতে হয়, তেমনই তাঁর বলে যাওয়া স্মৃতিকথার বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে পড়ে পাঠক-মন।

দেবপ্রসাদ রায়

৪

আমি যখন কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে, তখন অর্থাৎ ১৯৬৬-তে রাজ্য জুড়ে কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া প্রবল হয়ে উঠল। খাদ্য আন্দোলন হয়েছে এবং অতুল্য ঘোষ আর প্রফুল্ল সেনকে নিয়ে নানারকম গল্পগুজব বাতাসে ছড়াচ্ছে প্রতিদিন। তার মধ্যে একটা গল্প ছিল খুব জনপ্রিয়। সেটা হল— গঙ্গায় একটা নৌকা চেপে অতুল্য ঘোষ আর প্রফুল্ল সেন বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ ঝড় উঠল। নৌকাটা ডুবে গেল। তাহলে কে বাঁচল? উত্তর হল— বাংলার মানুষ।

এ থেকে পরিস্থিতি খানিকটা অনুমান করা যাবে। এই অবস্থায় তরুণ প্রজন্ম কংগ্রেসি ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হবে, এমন আশা করাটাই ভুল ছিল। তাই ছাত্র পরিষদের সঙ্গে খুব বেশি ছেলেমেয়ে যুক্ত ছিল না। এই কারণেই আমাদের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ’৬৬-তেই আমাকে এসি কলেজে ছাত্র পরিষদের কনভেনর করে দেওয়া হল। সে বছর কলেজ নির্বাচনের আগে ‘নমিনেশন জমা দিতে দু’মিনিট দেরি হয়েছে’— এই অভিযোগে আমাদের সব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেওয়ায় আমরা চলে গেলাম আদালতে। শেষ অবধি নির্বাচন হলেও আমরা আর অংশ নিইনি। কিন্তু মনোনয়নপত্র জমা দিতে যে আমাদের আদৌ দেরি হয়নি, সে বিষয়ে আমি আজও নিশ্চিত।

মনে আছে, সেবার কলেজ নির্বাচনে বিশ্বনাথ বসু প্রোভাইস পদে আর বাপ্পা হোড় জিএস পদে নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, ওই সময় কলেজ রাজনীতিতে যারা খুব প্রকট ছিল, যাদের মনে হয়েছিল পরবর্তীতে চুটিয়ে রাজনীতি করবে, তারা প্রায়

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

কেউ আর ভবিষ্যতে রাজনীতির পথে আসেনি। যেমন উদয় শিকদার ছিল এসএফ-এর দায়িত্বশীল নেতা। সে চলে গেল ব্যাঙ্কের চাকরিতে। শৌরি সেনগুপ্ত ছিল এসএফ-এর আরেক ডাকসাইটে নেতা। সেও আর রাজনীতি করেনি। ওর সঙ্গে অনেক পরে দেখা হয়েছিল দিল্লিতে। ও তখন ইগনু-তে চাকরি করছে। বাপ্পা হোড়, অমিত মিত্র— এরাও এসএফ-এর গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিল তখন এসি কলেজে। দু’জনেই প্রফেশনে চলে গিয়েছে। আমাদের ছাত্র পরিষদের বিকাশ দাশগুপ্ত, সুধাংশু সরকার, সুনীলদা (ওর পদবি মনে পড়ছে না)— এরাও আর রাজনীতি করেনি।

ঐতিহাসিক আনন্দগোপাল ঘোষ আমার সহপাঠী ছিল কলেজে। আনন্দ অবশ্য সরাসরি রাজনীতি করত না, কিন্তু আমাদের সমর্থন করত। আমি আনন্দ আর পরিমল বেশ বন্ধু ছিলাম। অবশ্য পরিমলের সঙ্গেই আনন্দর খাতির ছিল বেশি। পরিমল কিছুদিন রাজনীতি করেছিল। পরে ধূপগুড়ি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়। পরিমল শেষে পণ্ডিচেরির আশ্রমে চলে যায়।

এইভাবে ১৯৬৭ এল। কংগ্রেস বিপর্যয়ের স্বাদ পেল ন’টি রাজ্যে হেরে গিয়ে। রাজ্যে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন প্রায় তলানিতে। বিধানসভায় সেবার আমরা পেলাম ১২৭টি আসন। খগেন দাশগুপ্ত অবশ্য জিতলেন জলপাইগুড়িতে। তিনি বিরোধী দলের প্রধান হিসেবে মনোনীত হলেন। রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আবির্ভাব হল। অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তবে সেবার নির্বাচনে আমি খুব একটা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম না। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট টিকল না। তখন দলত্যাগ বিরোধী আইন ছিল না। আশু ঘোষ সতেরোজন বিধায়ককে ভাঙিয়ে নিলেন, যাঁদের মধ্যে স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষও ছিলেন। তাঁকে সামনে রেখে একটা বিকল্প সরকার গঠনের প্রস্তাব এল।

বিকল্প সরকার গঠিত হলেও জনগণের সহানুভূতি ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রতি। তাই রাজ্য জুড়ে বামপন্থীদের মিছিল-মিটিং শুরু হয়ে গেল সে সময়ে। বন্‌ধ ইত্যাদি ডাকা হতে লাগল ঘন ঘন। মনে আছে, সেবার জলপাইগুড়িতে এমনই একটা বন্‌ধের প্রতিবাদে আমরা মিছিল বার করেছি। রিকশায়

’৬৭-র নির্বাচনে মালবাজার বিধানসভা সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় আমাদের বরেন ভৌমিক দাঁড়িয়েছিলেন আলিপুরদুয়ার থেকে। সেখানে সম্ভবত ননি ভট্টাচার্যর কাছে তিনি হেরে যান। বরেনবাবুর দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা আবার গড়ে উঠতে শুরু করেছিল।

মাইক লাগিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখা হচ্ছে। সেই মিছিলটাই ছিল আমার সরাসরি প্রথমবার কংগ্রেসের হয়ে নামা। তার আগে ছাত্র পরিষদেই আমার কাজকর্ম মোটামুটি সীমিত ছিল। সেই মিছিলটা পরিচালনা করছিলেন অরুণাংশু ভৌমিক। মিছিলটা যখন তিন নম্বর গুমটিতে এল, তখন অরুণাংশুবাবু মাইক্রোফোনটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘এখানে তুমিই বলো।’

সেই প্রথম কংগ্রেসের হয়ে তার ঝান্ডার নিচে দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা করা। কী বলেছিলাম বা কেমন বলেছিলাম তা আর মনে নেই, কিন্তু অরুণাংশুবাবু বলেছিলেন, ‘ঠিক আছে। ভাল হয়েছে।’

কিন্তু কাহিনি বাকি ছিল। সে মিছিল নিয়ে আমরা কদমতলায় এলাম। জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র হল কদমতলা। সেখানে ভাল বক্তা বলবেন— এটাই স্বাভাবিক। তাই অরুণাংশু ভৌমিক বলতে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি শুরু করামাত্রই একটা ইট উড়ে এসে তাঁর মাথায় পড়ল। মাথা ফেটে রক্তারক্তি ব্যাপার। তবুও অরুণাংশবাবু দমে না গিয়ে বলতে লাগলেন, ‘বন্ধুগণ! যিনি আমাকে এইমাত্র ইট দিয়ে আঘাত করলেন, তাঁকে আমার অভিনন্দন!’ কিন্তু এর পরে যেভাবে লোকজন তেড়ে আসতে শুরু করল, তাতে আর অভিনন্দন জানাবার অবকাশ থাকল না। মুহূর্তের মধ্যে আমরা ছত্রভঙ্গ। আর-একটা বিরাট জনস্রোত বিকল্প সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে শহরময় মিছিল করে বেড়াতে লাগল। আত্মগোপন করে থাকা ছাড়া আমাদের আর উপায় থাকল না।

কিন্তু আমাদের আসন বিধানসভায় ১২৭। সতেরোজনকে যুক্ত করে আমরা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য যখন তৈরি হচ্ছি, তখন স্পিকার বিজয় ব্যানার্জি তাঁর ঐতিহাসিক রুলিং দিলেন। জানালেন যে, প্রফুল্ল ঘোষকে সামনে রেখে যে বিকল্প সরকার গঠিত হচ্ছে, তার কোনও সাংবিধানিক বৈধতা নেই। তিনি বিধানসভা ভেঙে দিলেন। ফলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন অনিবার্য হয়ে গেল।

স্পিকার হিসেবে বিজয় ব্যানার্জি ওই রুলিং দিতে পারতেন কি না তা নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়েছিল। আমি যখন পরে পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স নিয়েছি, তখন এইট্‌থ পেপারে যে একটাই ‘এসে’ লিখতে হত, তার তালিকায় ‘স্পিকার’স রুলিং’ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যা-ই হোক, ১৯৬৮ এল। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে রাজ্যপাল ধরমবীরের তত্ত্বাবধানে। আমি ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেলাম। যদিও জেলার ছাত্র পরিষদ, কিন্তু তখন শহরের বাইরে জেলার অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক ছিল না। যাতায়াতের সমস্যা ছিল অন্যতম কারণ। আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার ঝামেলা ছিল বেশ। পলাশবাড়ির ওখানে ব্রিজ ছিল না। অবশ্য চিন-ভারত যুদ্ধের সময়, ’৬২-তে তিস্তা সেতু হয়েছিল। ফলে জেলার নানা অংশে যোগাযোগ রাখা ছিল কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমরা জানতাম যে আলিপুরদুয়ারের ছাত্র পরিষদ ছিল খুব শক্তিশালী।

’৬৭-র নির্বাচনে মালবাজার বিধানসভা সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় আমাদের বরেন ভৌমিক দাঁড়িয়েছিলেন আলিপুরদুয়ার থেকে। সেখানে সম্ভবত ননি ভট্টাচার্যর কাছে তিনি হেরে যান। বরেনবাবুর দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা আবার গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। ওই সময় একটা কারণে আলিপুরদুয়ারের ছাত্র পরিষদ সংবাদের শিরোনামে চলে আসে। জ্যোতি বসু এসেছিলেন আলিপুরের সভা করতে। ছাত্র পরিষদ সভার দিন বন্‌ধ ডাকে এবং বন্‌ধ আশাতীত সফল হয়। মনে আছে যে আলিপুরদুয়ার ছাত্র পরিষদের এই নীতি বেশ কয়েক জায়গায় অনুসৃত হয়েছিল। জ্যোতিবাবু সভা করতে গেলেই বন্‌ধ ডাকা হত।

দুই অধ্যাপক সুধীররঞ্জন ঘোষ আর তরুণ ভট্টাচার্যর কথা উঠে আসে এ প্রসঙ্গে। এই দু’জন সে সময় অভিভাবকের মতো আলিপুরদুয়ার ছাত্র পরিষদকে আগলে রেখেছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট, বিকল্প সরকার, বিজয় ব্যানার্জি রুলিং, রাষ্ট্রপতি শাসন ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, তখন একদিন অন্তিদা খবর দিলেন, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। আমরা তখন জানতাম যে আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্যামল ভট্টাচার্য। প্রিয়দার সঙ্গে ওই সময়েই প্রথম আলাপ। কিন্তু ১৯৬৮-তে আরও একটা ব্যাপার ঘটে গেল। আচমকা বন্যায় জলপাইগুড়ি শহর তছনছ হয়ে গেল একরাতে। দিনটা ছিল চৌঠা অক্টোবর, কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর আগের রাত।

সেই স্মৃতি আজও শিহরন জাগায়!

(ক্রমশ)

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
মালবাজার
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
চালসা
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল-
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি-
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

১৯

খুদিবাবু খুব একটা স্বস্তিতে নেই। উপেনকে নিয়ে গগনেন্দ্র যে কাহিনি শুনিয়েছে, সেসব শুনে মনে মনে হেসেছেন তিনি। গগনেন্দ্র বাচ্চা ছেলে। উপেনও তা-ই। বন্ধুর হয়ে আরেক বন্ধু এই বয়সে লড়াই করবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গগনেন্দ্র লুকাচ্ছেটা কী? ব্যবসা করবে ভাল কথা। টাউনে তো ব্যবসায়ীদেরই কদর। দিনবাজারের কাছে জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুলের জন্য চায়ের ব্যবসায়ীরাই তো কত টাকা তুলে দিল। কিন্তু ব্যবসা করতে গিয়ে এত লুকোছাপার প্রয়োজনটা কোথায়? নির্ঘাত উপেনের বিষয়ে গগনেন্দ্র কিছু লুকাচ্ছে।

কী লুকাচ্ছে, সেটা অবশ্য জেরা করলেই জেনে যেতেন খুদিবাবু। সে ক্ষেত্রে গগনেন্দ্র আর তাঁর বাড়িতে দ্বিতীয়বার আসত না। কিন্তু ঘটনা এই যে, গগনেন্দ্রর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনেই খুদিবাবুর বাড়ির সকলেই কমবেশি ছেলেটাকে পছন্দ করে ফেলেছে। এই অবস্থায় ছেলেটাকে মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া খুদিবাবুর কর্তব্য। ডিটেকটিভ কাহিনির ভক্ত গগনেন্দ্র শার্লক হোমসের গল্প পড়েনি জেনে তিনি প্রাণাধিক প্রিয়, খাসা চামড়ায় বাঁধানো সোনার জলে নাম লেখা দু'খণ্ড আর্থার কোনাল ডয়েল স্বেচ্ছায় ধার দিয়ে দিলেন কী কারণে? গগনেন্দ্র সে বই ফেরত দিতে আরেকবার আসবে বলেই না! তারপর সে ছেলের না-পড়া ডিটেকটিভ বইয়ের কি অভাব আছে খুদিবাবুর আলমারিতে?

কিন্তু অস্বস্তি সেখানে নয়। সেটা জড়িয়ে আছে উপেনের লুকিয়ে থাকার কারণ নিয়ে। ওর মধ্যে চরমপন্থী মনোভাবের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত। পরিবারের সমর্থন পাবে না জেনে গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবী দলে আবার যোগ দিয়েছে কি না, সেটা জানা দরকার। তবে কলকাতায় সে যায়নি। উপেনের সঙ্গে গগনেন্দ্রর দেখাসাক্ষাৎ হয়। জেরা করার সুযোগ পেলে অবশ্য অনেকটাই জানা যেত। কিন্তু গগনেন্দ্র এখন পরিবারের পছন্দের।

এসব ভাবতে ভাবতে হেঁটেই আদালত থেকে ফিরছিলেন খুদিবাবু। কাল থেকে পুজোর ছুটি শুরু। মাসখানেকের মধ্যে দেখা হবে না বলে তিনি আর পরিমলবাবু ফিরছিলেন গল্প করতে করতে। পরিমলবাবুর বাড়ি পাটগ্রামে। তিনি বেশ উৎসাহ নিয়ে বোঝাচ্ছিলেন যে কী কী কারণে তাঁর দেশের বাড়ির দুর্গা পুজো দেখলে টাউনের লোকেরও তাক লেগে যাবে। খুদিবাবু সেসব শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন দেখে তিনি সুর বদলে বললেন, 'কী হল খুদিদা? মন যে কিঞ্চিৎ উচাটন দেখছি?'

‘ব্যাটাদের বাড়িতে কোনও ঠাকুরঘর নেই ভাবতে পারো?’ আরও উৎসাহ নিয়ে বলা চালিয়ে যেতে থাকেন পরিমলবাবু। ‘বেম্মর নাকি কোনও মূর্তি হয় না! মূর্তি যখন হয় না, তখন বেম্ম হল ভূত। ব্যাটারা তাহলে ভূতের উপাসনা করে! তার মানে ব্যাটারা সব ওঝা!’ বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খানিকটা খ্যা খ্যা করে হেসে বললেন, ‘আরে, এত তাড়াতাড়ি হাঁটছ কেন খুদিদা? কী হল? বেগ পেয়েছে নাকি?’

খুদিবাবু একটু বিব্রত হয়ে বললেন, ‘তা একটু আছে।’

‘মেয়েটার এবার বিয়ে দিয়ে দিন তো! পাটগ্রামের গুহদের সেজ ছেলেটার সঙ্গে শোভা মায়ের খাসা মিলবে, বুঝলেন?’

‘আরে না না। মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভাবছি না।’

‘তা বললে চলে দাদা! আমি-আপনি তো আর বেম্ম নই যে বিয়ে না দিয়ে মেয়েদের ধিঙ্গি বানিয়ে পথে ছেড়ে দেব।’

আগে হলে পরিমলবাবুর এই উক্তিতে খুদিবাবু আহ্লাদ পেতেন। কিন্তু আজ শুধু বললেন, ‘ব্রাহ্মদের কথা আলাদা।’

পরিমলবাবু উৎসাহ পেয়ে বললেন, ‘আলাদা তো বটেই! আসলে ওদের ব্যাপারটা কী জানেন... ইংরেজদের মোসাহেবি করা। রবি ঠাকুরের কথাই ভাবুন! ব্যাটা পিরালির বামুন! বলতে গেলে নিচু জাত। সে কিনা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে! ওসব কোনও পদ্য হল? বেম্ম বলেই লন্ডনের প্রফেসরগুলো ওকে কনসিডার করেছে।’

খুদিবাবু কোনও কথা না বলে নীরবে একটু জোরে হাঁটতে লাগলেন।

‘ব্যাটাদের বাড়িতে কোনও ঠাকুরঘর নেই ভাবতে পারো?’ আরও উৎসাহ নিয়ে বলা চালিয়ে যেতে থাকেন পরিমলবাবু। ‘বেম্মর নাকি কোনও মূর্তি হয় না! মূর্তি যখন হয় না, তখন বেম্ম হল ভূত। ব্যাটারা তাহলে ভূতের উপাসনা করে! তার মানে ব্যাটারা সব ওঝা!’ বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খানিকটা খ্যা খ্যা করে হেসে নিলেন পরিমলবাবু। তারপর বিস্ময়ের সুরে বললেন, ‘আরে, এত তাড়াতাড়ি হাঁটছ কেন খুদিদা? কী হল? বেগ পেয়েছে নাকি?’

হাতের ইশারায় একটা ঘোড়ার গাড়িকে থামিয়ে খুদিবাবু সেটায় দ্রুত উঠে মুখ বাড়িয়ে বললেন, ‘চলি পরিমল! কোর্ট খুললে কথা হবে।’

আসলে পরিমলবাবুর কথায় ভিন্ন কারণে খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন খুদিবাবু। বিয়ে হলে মেয়ে পরের হয়ে যায়— এ সত্য তিনি জানেন। কিন্তু পরিমলবাবুর কথায় আচমকা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল শোভার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ক্রন্দনমুখর চলচ্চিত্র। দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল তাঁর পিতৃসত্তা। মেয়ের জন্মের পর থেকেই ভেবে আসছেন তার বিয়ের কথা। কিন্তু শোভাহীন গেরস্তালি তাঁর কাছে ছিল অযৌক্তিকভাবে অকল্পনীয়। হঠাৎই সেই গেরস্তালির বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রায় দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে না উঠে পড়লে পরিমলবাবু প্রকৃত বিস্মিত হতেন। কারণ তিনি জল দেখতেন খুদিদার চোখে।

বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে আবার মনের জোর ফিরে পাওয়ার পর খুদিবাবু বাইরের বারান্দায় এসে বসলেন। বিকেলটা বেশ চমৎকার। পরশু অমাবস্যা। তারপরেই দেবীপক্ষের শুরু। অদূরে মাঠে পুজোর মণ্ডপ বাঁধার কাজ চলছে। একটা গাছের নিচে কয়েকজন মুসলিম মজুর গোল হয়ে বসে হুঁকো টানছে। দেখতে দেখতে টাউনে পুজো বেশ কয়েকটা বেড়ে গেল। পুজো মানেই তো উমার বাপের বাড়িতে আসা।

খুদিদা অন্য কিছু ভাবতে চাইলেন। তখনই তাঁর চোখে-মুখে বেশ আমোদ ফুটে উঠল। একটা ঘোড়ার গাড়ি থেকে গোপাল ঘোষ নামছে। বেচারার বজরা এখনও জলে ভাসেনি। মনে হয় না সে বিষয়ে গোপাল ঘোষের আগ্রহ অবশিষ্ট আছে। তবে বেশ কিছুদিন তাঁর সঙ্গে খুদিবাবুর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

সামনের উঠোনটা প্রায় দৌড়ে পেরিয়ে বারান্দায় উঠে গোপাল ঘোষ কোনও ভূমিকা ছাড়াই বললেন, ‘দেড় লাখ! বুঝলেন খুদিদা! ওয়ান ল্যাখ অ্যান্ড ফি-ফটি থা-উ-জেন্ড!’

‘বোসো বোসো!’ খুদিবাবু মৃদু হেসে সামনে রাখা বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন— ‘দেড় লাখ ব্যাপারটা কী?’

‘টাকা! টাকা! মানি! রুপিজ!’

‘পেলে নাকি?’

‘জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুলের জন্য দেড় লাখ চাঁদা উঠেছে টাউনে। শোনেননি?’

‘তা-ই বলো! আমি কালই শুনলাম। আনএক্সপেক্টেড! এতটা ভাবা যায়নি।’ খুদিবাবু স্বীকার করলেন, ‘খুব ভাল স্কুল হচ্ছে বুঝলে? টাউনে আর ডাক্তারের চিন্তা থাকবে না।’

‘শুনলাম ফার্স্ট ইয়ারে নাকি ভরতি নেওয়ায় কিছু কনসিডার করবে?’

‘তা জানি না। তবে ম্যাট্রিক পাশ না হলে বোধহয় হবে না।’

গোপাল ঘোষ কথাটা শুনে একটু বিষণ্ণ হলেন। চেয়ারে এতক্ষণে বসে একটু ম্লান গলায় বললেন, ‘ননম্যাট্রিক কনসিডার করলে আমি ভরতি হতাম।’

‘সে কী! ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারি পড়তে?’

গোপাল ঘোষ চুপ করে বসে রইলেন। এমন একটা প্রশ্ন যে থাকতে পারে, সেটা তিনি এই প্রথম বুঝলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অল্প হেসে বললেন, ‘সেইটাই তো প্রবলেম খুদিদা! তবে চান্স পেলে ব্যবসা চালিয়েও জ্যাকসন স্কুলে পড়া যায় কি না চেষ্টা করে দেখতাম। আচ্ছা, মেডিক্যাল স্কুলেও কি পড়া ধরে?’

‘তা পলিটিক্সের কী বুঝছ?’ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য খুদিবাবু বললেন। গোপাল ঘোষ পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে আবার যথাস্থানে রেখে একটু উৎসাহ নিয়ে বললেন, ‘এইবার একটা কিছু হবেই বুঝলেন? পুজোটা গেলেই দেখবেন গান্ধিজি নতুন একটা চাল দেবেন। তবে একটা কথার মিনিং বলুন তো আমাকে। মার্কসের কথা বলেছিল যে ছেলেটো, ওর মুখেই শুনলাম। ডিক্টেটরশিপ অব প্রোলেতারিয়েত! আমি তো গোড়াতে উচ্চারণই করতে পারছিলাম না।’

‘ছাড়ো ওসব। আবার রেঙ্গুন যাচ্ছ কবে?’

‘ভাবছি টি বিজনেসে ঢুকব। গোপাল টি এস্টেট নামটা কেমন হবে খুদিদা?’

‘ছি!’ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন খুদিবাবু, ‘যাক গে! তোমার তো জামালদহ বন্দরে ভালই যোগাযোগ, তা-ই না?’

‘হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।’

‘সেখানে মাল চালানের ব্যবসা করে গগনেন্দ্র মিত্র। চেনো?’

‘ওর বাপকে চিনি। বাড়ি তো মাথাভাঙায়। গগনের দিদার বাপের বাড়ি আর আমার খুড়তুতো ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি তো একই গ্রামে। ওর বাপের তিন ছেলে। গগন সবার ছোট। সবাই চেনে।’

এই পর্যন্ত এত টানা উৎসাহের সঙ্গে বলার পর একটু থমকে যান গোবিন্দ ঘোষ। তাঁর মুখে সামান্য হাসি ফুটে ওঠে। খুদিবাবুর দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ‘জামাই করতে পারেন। দু’টিতে খুব মানাবে। বজরায় চেপে মাথাভাঙায় যাব বরযাত্রী হয়ে!’

খুদিবাবু কিছু বললেন না। সামনে মাঠটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আসলে তিনি বোধহয় চাইছিলেন যে, গোপাল ঘোষ বুঝে নিক এই চুপ করে থাকার অর্থ।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: সুবল সরকার

উতল হাওয়ার সন্ধানে

কারে নি জাবে কা মিটিনমে। এখনও সুতলে আহিস। দো বাজে মিটিন রাইখে লিডার মন। (কী রে, মিটিং-এ যাবি না, এখনও শুয়ে আছিস? দুটোর সময় মিটিং ডেকেছে লিডাররা।) চাঁদমণিবাবুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, পাতিরাম কাহা? ও জঙ্গল গিয়েছে লাকড়ি আনতে। সকাল থেকে বুখার বুখার লাগছে। তুই যাবি তো? বলে রাবু। তোর কী মনে হয় লিডারমন এবার কিছু করতে পারবে? কী জানি। বাগানের কাম না হলে এবার সবাইকে মরতে হবে। জঙ্গল ভি তো সাফ হয়ে গেল। লাকড়িই বা কোথায় মিলবে? তয় শুইতলে রহো, ময় জাওথু। (তুই শুয়ে থাক, আমি যাই)। চাঁদমণি চলে যায়। রাবু ভাবে, ও আর পাতিরাম সংসার পেতেছে দু'বছর হল। এখনও কোনও ছৌয়া পোতা নেই। তাই রক্ষে। নিজেদের দুটো পেট খেয়ে না খেয়ে কোনওরকমে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চাঁদমণি, চারটে বাচ্চা নিয়ে ওর তো আরও অবস্থা খারাপ। আর ওর বুড়া (স্বামী) ভি তো শিরাই গেলাক (মরে গিয়েছে)। বে মরদ, বেচারা। ভাবতে ভাবতেই পাতিরাম এসে লাকড়ির বোঝাটা মাথা থেকে উঠোনে ফেলে। না-খাওয়া হাড় বার করা শরীরটা থেকে কিছুটা ঘাম ঝরে পড়ে। পাতিরাম হাঁক দেয়, এ রাবু, মোকে এক গিলাস পানি দে তো। রাবু সিলভারের গেলাসে জল এনে ওর হাতে দেয়। ঢকঢক করে কিছুটা জল খেয়ে পাতিরাম বলে, খানাউনা কিছু করেছিস? রাবু উদাস মুখে তাকায়, কা করবু, ঘরমে কোনও নখে। এক কাম কর, কাল যে কান্দা এনেছিলাম, উকে সিজাও (সেদ্ধ কর)। বিকেলে লাকড়ি বিক্রি করে চাল-উল নিয়ে আসব। ভাতের স্বাদ ওরা প্রায় ভুলতে বসেছে। ফরেস্টের মেটে আলু, কচু, কান্দা খেয়েই প্রায় দিন কাটে ওদের। রাবু শিমুল কান্দা হাতে নিয়ে যেতে গিয়ে বলে, ও এক বাত, চাঁদমণি এসেছিল। দো বাজে গুদাম মাঠে মিটিং আছে। তুই যাবি না? হ্যাঁ জাইক তো পারি, আইজ কোনও ফয়সালা আচ্ছা হুবি। সব লিডারমনই, সব কোই আবি, সাহিব ভি আউই। (যেতে তো হবেই, আজ মনে হয় কোনও সমাধান হয়ে যাবে। নেতারা সবাই আসবে, সাহেবও আসবে।) ম্যানেজারবাবু ভি তো কাল এসেছে। তুই কান্দা বানা, আমি ঘুরে আসি।

রাবু অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঘর বাঁধতে এসেছিল পাতিরামের সঙ্গে। স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই চলছিল ওদের দিনগুলি। পরব-পার্বণে ওরা উচ্ছল হরিণ-হরিণীর মতোই মেতে উঠত। বর্ষার পাহাড়ি নদীর মতোই ভরন্ত যৌবন ছিল ওর। বুকের উপর যেন এক সমুদ্র জ্যোৎস্নার ঢেউ। ভারী ঠোঁট দুটোতে যেন মাদকতা মেশানো। মনে পড়ে, বছর তিনেক আগে

বাগানের পুজোতে যাত্রা (নাচ-গান) হচ্ছিল। পাতিরাম খুব সুন্দর মাদল বাজায়। মাদলের তালে তালে অনেকের সঙ্গে ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কোমর ধরে নাচছিল। নাচতে নাচতেই লক্ষ করছিল পাতিরামের সুগঠিত পেশিবহুল হাত দু'খানি কী অদ্ভুত ছন্দমাধুর্যে তাং ধিতাং, তাং ধিতাং বোলে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ছন্দের আবেশে দুলে ওঠে রাবুর তন-মন। নাচ থেমে যেতে যে যার মতো ছড়িয়ে পড়ে নিজের খুশিতে।

রাবু সাইমা, গীতুর সঙ্গে পা বাড়িয়ে ছিল। পাতিরাম ডাকে, এ রাবু, আমার সঙ্গে মেলায় যাবি ঘুমনে। চল না। রাবু বলে, মোর মা-বাপ পুছবে তো। আরে চল না, জলদি চইল আবু। কোনও দিন কহবে চল। রাবু পাতিরামের হাত ধরে চলে। তারপর বাসে করে বানারহাটের মেলায় গিয়ে ওরা যেন ঢেউ-ভাঙা নদী। পাতিরাম ওকে সস্তা দরের লিপস্টিক, কাচের চুড়ি কিনে দেয়। হাতে হাত রেখে ভিড় ঠেলে ঘুরতে ঘুরতে গুনগুনিয়ে গান গায় পাতিরাম। 'মোর দিল তো লেইজা, লেইজা, এ রে গেরি লেইজা লেইজা'। রাবু হাসে। দু'জনে নাগরদোলায় চড়ে। এগ রোল, চাউমিন খায়। তারপর এক সময় খুশির উতল হাওয়াতে ভাসতে ভাসতে বাগানে ফিরে আসে।

দেখতে দেখতে চার দিনের পুজোর ছুটি ফুরিয়ে যায়। আবার বাগানের কর্মময় জীবন শুরু হয়। রাবু বাগানে পাতি তোলে, হাজিরা পায়। পাতিরাম গাছ ঝুরনি করে, কলম কাটে। পারমানেন্ট লেবার। মাহিনা পায় মাস গেলে। বাগান ছোট বলে ওদের কারওই কোনও পাকা কোয়ার্টার নেই। মুলিবাঁশের বেড়ার ছাপড়া ঘর। বাতির ব্যবস্থাও কোম্পানি করে দেয়নি। তবু তার মধ্যেই ওদের সুখ। সারাদিনের পাতি তোলার পর ওজনবাবুর কাছে পাতি ওজন করে হিসেব লিখিয়ে বাগানের সরু পথ দিয়ে ফেরে পাতি টেপার জোনিমনরা (মেয়ে বউ)। পথে পিপুল গাছের নিচে বসে সবার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলতে বলতে এক-দো গিলাস হাড়িয়া খেয়ে চাঙ্গা হয়। রাবুও ওদের সঙ্গে বসতে যায়। পাতিরামের দোস্ত বসন্ত এসে বলে, এ রাবু, একছিন শুইনকে যানি। উদ্দে পাতিরাম তোকে বোলাথে, বাত হায় তোরসে। (এই রাবু, একটু এদিকে শুনে যা, পাতিরাম তোকে ডাকছে। তোর সঙ্গে কথা আছে)। পাতিরামের দিকে হাত তুলে দেখায়। রাবু ওর সঙ্গিনীদের বলে, তোরা যায়, ময় তানিক পিছে যাবু। ও এগিয়ে যায় পাতিরামের দিকে। কী রে, ডাকছিস কেন? পাতিরাম ওর হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে সরু নালার পাশে বসে। রাবু হাত ছাড়ায়। কা করোথিস, ছোইড়দে। না নি ছড়বু, পাতিরাম বলে। ওকে আরও কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। রক্তিম আবেশে ছড়িয়ে পড়ে ওর মুখ। বুকের জমিনে হিমেল হাওয়ার স্রোত। কিন্তু ওর ভাল লাগে এ বন্ধন। এ রাবু, তোকে ময় শাদি করবু। রাবুর মুখটা হঠাৎ ম্লান হয়ে ওঠে। ও বলে, কীভাবে হবে? তোরা ওরাওঁ। আমরা তো লোহারা। ঘরসে মা-বাপ শাদি নি দেবে। তর চল হামিন ভাইগকে শাদি করবু।

ভেগেই শাদি করে ওরা। তারপর উঠে আসে পাতিরামের ঘরে। পাতিরামের মা এতোয়ারি বুড়ি পোস্ট অফিসের জমানো টাকা তুলে একদিন গাঁওয়ের মাতব্বর ডেকে দারু, হাড়িয়া, মাংস, রুটি খাওয়ায়। খাসি, মোরগ কেটে রাবু আর পাতিরামের মুখে রক্তের ছোঁয়া দেয়। তামা-তুলসী চাটিয়ে ওদের সমাজে তোলে রাবুকে। দেখতে দেখতে দিন কেটে যায়। একদিন ওদের সুখের সংসারেও অসুখের ঝড় নেমে আসে। অনেকদিন ধরেই বাগানে নানা সমস্যা নিয়ে ভুগছিল শ্রমিকরা। কোম্পানি ওদের ঠিকমতো বেতন দিচ্ছিল না। তলপ, ডবলি, এমনকি রেশনও ঠিকমতো পাচ্ছিল না ওরা। বাগানের লেবারদের উন্নতির কোনওরকম ব্যবস্থা না করেই দিনের পর দিন মুনাফা লুটছিল মালিকপক্ষ। অনেক দিনের বঞ্চনার ক্ষোভে ওদের শীতল রক্তও আগুন হয়। এভাবেই ওরা একদিন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিভিন্ন দাবি নিয়ে ওরা ঘেরাও করে ম্যানেজার আর ওয়েলফেয়ারবাবুকে। বেগতিক দেখে সেই রাতেই বাগানে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায় ম্যানেজার। সেই থেকে এখন পর্যন্ত ঝুলছে তালা। অনেকবার অনেক বাতচিত (আলোচনা) মিটিং হওয়ার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি। নেতা লোক আসে। বড় বড় ভাষণ দেয়। বাগান ইউনিয়নের সেক্রেটারি সুশীল ভগতের সঙ্গে বৈঠক করে। ফির চলে যায়। দফায় দফায় মালিক সাহেবের সঙ্গেও ইউনিয়নের লোক বাতচিত চালায়।

দেখতে দেখতে ছ'মাহিনা হয়ে গেল বাগান বন্ধ। আবার পুজো আসছে। না খেয়ে, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডায়েরিয়ায় ভুগতে ভুগতে মরেছে অনেকে। মাস দুই আগে এতোয়ারি বুড়ি ম্যালেরিয়ায় ভুগে মারা যায়। হাড়িয়া, পাকি (দেশি মদ) খেয়ে খেয়ে লিভার পচেছিল আগেই। তারপর ম্যালেরিয়া। ওষুধ নেই। বাগান, হাসপাতাল বন্ধ। ডাক্তারবাবু বেতন না পেয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গিয়েছে তিন মাস হল। একমাত্র উপায় ঝাড়ফুঁক। ওঝা দেখায় ওরা, ঝাড়ফুঁক করে। রাবু চ্যাংমারি স্কুলে আট কিলাস পর্যন্ত পড়েছে। ও বোঝে ঝাড়ফুঁকে বিমারি (অসুখ) কমবে না। বুখারটা বোধহয় বেশি হচ্ছে। মাথার শিরাগুলি টনটন করছে। শরীরে এক অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয় ওর। পাতিরাম সেই যে গেল, আর পাত্তা নেই। কী জানি কারও পাল্লায় পড়ে দারু পিতে বসে গেল নাকি। ইদানীং পাতিরামের দারু খাওয়া বেড়ে গিয়েছে। ফরেস্টের কাঠ বোঝা করে বিক্রি করে যা পায়, অনেকটা দারু খেয়ে উড়িয়ে দেয়। বাগান বন্ধ। তব ভি (তবুও) অর্জুন দর্জির চোলাই দারুর দুকান (দোকান) বন্ধ হয় না। কিছু ভাবতেও ভাল লাগে না ওর। সকাল থেকে ওর পেটেও কিছু পড়েনি। কান্দা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এক বাটি নিমক চা (নুন-চা) বানায় নিজের জন্য। একখানা কান্দা তুলে মুখে দেয়। জ্বরের মুখে তেতো তেতো বিস্বাদ লাগে। উলটি (বমি) আসে। নিমক চায়ে দু-তিনবার চুমুক দিয়ে ও গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। জারে (ঠান্ডায়) কাঁপে। শরীরের ভিতর শিরশিরিয়ে যেন ঠান্ডা নামে। ছেঁড়া কাপড়টা ভাল করে জড়িয়ে কুঁকড়ে শুয়ে থাকে ও। ঘোরের মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুমের মধ্যে এক স্বপ্নের দেশে যেন চলে যায় ও।

এক সুন্দর দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জিতিয়া উৎসবে মেতেছে ওদের গাঁও। সবার সঙ্গে ওরাও গিয়েছে জিতিয়া গাড়তে। টুকরিতে হাঁড়ি, সিন্দূর, সুপারি, শসা, মাছ, চালের রুটির উপকরণে ভরতি। ফাগুলাল বুড়ার মাদলের সঙ্গে লাজো, ফুলমতী গান গায়। 'ওদে ওদে আইজো তো জিতিয়া হোকে। বিজলি চমকে দিয়া নিই জাইলা কেইসে খেলব তিসরাতি। ওদে ওদে।' ওরাওঁ, বরাইক, মাহালি দম্পতিরা সন্তানকামনায় জিতিয়া দেবতার পুজো করে। ফুলমতী বলে, এ রাবু, মন লাগাইকে খিড়ামে (শসা) সিন্দূর ডাইলকে জিতিয়া দেওতাকে দে। অউর দোনো মিলকে মাঙ্গত কর। ইসবার তেরা ছৌয়া পোতা হোবে। এ পাতিরাম রাবুকর পাস আ। পাতিরাম এগিয়ে আসে রাবুর কাছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, মোকে পূজা করনি। ময়হি তো তোকে ছৌয়া দেবু। রাবু আলতোভাবে চোখ পাকায়। শনচরিয়া বলে ওঠে, নে হামিনকর সাথ গানা গা, ওদে, ওদে জিতিয়া আয়োথে— গানই গোঙানি হয়ে বেরিয়ে আসে। রাবু ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। লাল চোখে তাকায়।

বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। ওদাম মাঠ থেকে মিটিং-এর আওয়াজ আসে। পাতিরাম ফেরেনি এখনও। পঞ্চায়েতের কুয়োতে গিয়ে চোখে-মুখে জল দেয়। জল আনে এক বালতি। বুখারটা কম লাগছে। নুয়ে পড়া চালের মাচা থেকে ঝাড়ু নামিয়ে ঘর পরিষ্কার করে। জ্বর ঘামে সিক্ত কাপড়টা ছেড়ে মালবাবুর বউয়ের দেওয়া পুরনো শাড়িটা দিয়ে জড়িয়ে নেয় ওর ভিতর গ্রথিত পাতিরামের বীজকে। তারপর দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাই বিছিয়ে বসতে গিয়ে রাস্তায় চৌকিদার ফাগনার ছেলে সামবিরকে দেখে ডাকে, এ সামবির, মোর বুড়াকে দেখলে? সামবির বলে, হ্যাঁ, বুধিয়াকে সাথ পাতিরাম চাচা মিটিনমে গেলাক। আইজ কা মিটিন মুরুখ জোরসে হোওথে। আজ ফয়সালা হয়েই যাবে। রাবুর জীর্ণ, ক্লিষ্ট মুখে সূর্যাস্তের সবটুকু আলো এসে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে রাবু বসে থাকে পাতিরামের আশায়।

অঞ্জনা ভট্টাচার্য

স্কেচ: সুবল সরকার

উত্তরের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

সাহিত্যাকাশের বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বমহিমায় আলো বিচ্ছুরণ করে চলেছে নিরন্তর। সেইসব সাহিত্যসাধক তাঁদের সৃজনশীলতা, মননশীলতা সর্বোপরি সংবেদনশীল চেতনাবোধের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সাহিত্যপ্রেমী পাঠকবর্গকে অনাবিল আনন্দ দিয়ে আসছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম এক জ্যোতিষ্ক হলেন উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, গবেষক ও সুসাহিত্যিক ড. গৌরমোহন রায়।

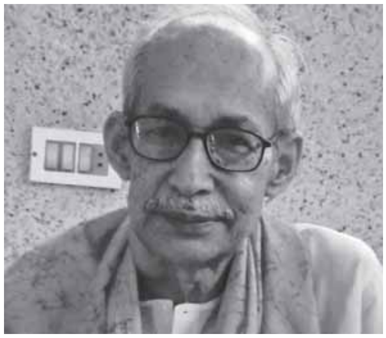

জন্মসূত্রে ড. রায় দক্ষিণবঙ্গীয়। জন্ম ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে। বারাসতের কাছে বামনগাছি। সেখান থেকেই বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করার পর স্নাতক স্রে শিক্ষা নিতে চলে আসেন সিটি কলেজ, কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

এর পর কর্মসূত্রে তিনি চলে আসেন ‘Queen of Hills’— ধীরে ধীরে নিজের অজান্তেই ভালবেসে ফেলেন দার্জিলিং তথা উত্তরবঙ্গকে— উত্তরবঙ্গবাসীকে। আত্মিক এক বন্ধন তৈরি হয় তাঁর উত্তরবঙ্গের সঙ্গে। দার্জিলিঙের শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে প্রথম তিনি কর্মে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে লরেটো কলেজ দার্জিলিঙে অধ্যাপনার কার্যে ব্রতী হন। বিগত প্রায় ৫০ বছরের অধিক সময় তিনি সাহিত্যসাধনায় নিজেকে মগ্ন রেখেছেন। তাঁর নিরলস সাহিত্যপ্রেম উত্তর তো বটেই, দক্ষিণবঙ্গও তাঁকে সুসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। তাঁর সাহিত্যে লোকসংস্কৃতি ও মানবতাবোধের ধারক ও বাহক। ১৯৭৮-৮০— এই সময়সীমার মধ্যে তিনি নেপালি আদি কবি ‘ভানুভক্তের রামায়ণ’ গ্রন্থের বাংলা গদ্যানুবাদ করেন। তাঁর রচিত ‘ভূগোল শিক্ষাদান পদ্ধতি’, ‘বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি’— বি.এড. শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারী দু’টি গ্রন্থ। তাঁর রচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— ‘তারাশঙ্করের সাহিত্য সমীক্ষা’ এবং ‘তারাশঙ্করের জীবন ও সাধনা’। কথাশিল্পীর উপর ড. রায়ের অপরিসীম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেখা এই বই দু’টি বাংলা সাহিত্যজগতের মূল্যবান দু’টি সম্পদ। এ ছাড়া ‘চোমং লামার ছোটগল্প’, ‘অমিয়ভূষণের রাজনগর’, ‘সৈয়দ মুজতবা আলি ও অন্য লেখা’, ‘উত্তরবঙ্গ ও অন্যান্য প্রবন্ধ’ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ড. রায়ের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ ‘আফ্রিকাই কি সকল মানব ভাষার আদি উৎস?’ বিশ্বের গুরুত্ব, ভাষাজগতে আফ্রিকার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত প্রবন্ধটি হল ‘নির্বাচিত প্রবন্ধসংগ্রহ’। এ ছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে ড. রায়ের অসংখ্য লেখা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য সম্মাননায় সম্মানিত হয়েছেন তিনি।

ড. রায়ের অসামান্য পাণ্ডিত্য শুধু তাঁর সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলা, ইংরেজি, নেপালি, হিন্দি— এই চারটি ভাষায় অবিরাম বক্তৃতা দিতে সক্ষম তিনি। এ ছাড়া সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও তাঁর অপরিসীম দক্ষতা রয়েছে। ড. গৌরমোহন রায় শুধুমাত্র সুসাহিত্যিক নন, তিনি একজন মননশীল কবিও বটে। অতি সাম্প্রতিককালে (১ অক্টোবর ২০১৫) তাঁর একটি কবিতার বই প্রকাশিত হল ‘বিষণ্ণ বাতাসে—একাকী’। গত বছর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে মালদা সংবেদন গোষ্ঠীর প্রকাশিত বই ‘ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রবন্ধ’-তে তাঁর আরও দু’টি লেখা পরিবেশিত হল— ১) ভাষাবিজ্ঞান— আলোচনার ভূমিকা ২) উত্তরবঙ্গের ভাষালিপির ইতিবৃত্ত— ইতিহাস ও ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা।

লাভলী বসু

ডুয়ার্স নিয়ে

ডুয়ার্সের রাজকাহিনি

বন-বন্য প্রাণসমৃদ্ধ অপরূপ সৌন্দর্যের ডুয়ার্সকে আজও পর্যটকদের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরা যায়নি। তাই সুন্দরী ডুয়ার্সের আকর্ষণ অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ পর্যটকদের অধরা। এই আক্ষেপ শুধু ডুয়ার্সবাসীর নয়, নেতা-মন্ত্রীদেরও। ‘বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ’ রাজনৈতিক স্লোগান না বাস্তব সত্য— এ নিয়ে নানাজনের নানা মত রয়েছে। শুধু বন বা বন্য প্রাণ কেন, পর্যটকদের ভাল ঠিকানা যে হতে পারে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সিটি অব বিউটি’ কোচবিহার, তাও তেমনভাবে প্রচার পায়নি।

তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকার যে অভাব রয়েছে, শেষ পর্যন্ত বোধোদয় হল কোচবিহার জেলা প্রশাসনের। ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থান করছে রাজকীয় শহর। কিন্তু তোর্সাপাড়ের বৃত্তান্ত সেভাবে প্রকাশ না পাওয়ায় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোচবিহার পর্যটনশিল্পে পিছিয়ে রয়েছে। এই সত্য উপলব্ধি করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোচবিহার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হল ‘কোচবিহার— দ্য ল্যান্ড অব রয়্যালস’। ৬৬ পৃষ্ঠার এই ‘কফি টেবল বুকস’ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান কোচবিহারের জেলাশাসক পি উল্যানাথন।

কোচবিহার ধরে রেখেছে তার উজ্জ্বল উত্তরাধিকার, অতীতের নগর এবং নাগরিক সভ্যতার উজ্জ্বলতা। কোচবিহারের ইতিহাস বহু প্রাচীন রাজতন্ত্রের ইতিহাস। রাজ্যের প্রান্ত জেলা কোচবিহার এক সুপরিকল্পিত নগর এবং দীর্ঘ সময় ধরে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। কোচবিহার গোমানিমারির প্রাচীন কামরূপ রাজ্য ও কোচ রাজাদের রাজত্বকালের ঐতিহ্য শুধু ঐতিহাসিক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই সময়ের নতুন দিশাও বটে। প্রাচীনের স্বার্থে বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দুই মলাটে তুলে ধরার প্রয়াস জেলা প্রশাসনের অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কোচবিহারের প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্ম, বহু শতাব্দীর প্রত্নতত্ত্ব এবং তার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ, একই সঙ্গে কোচবিহারের উৎসব, তার শিল্প প্রয়াস এবং হস্তশিল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবার চেষ্টা হয়েছে এই ‘কফি টেবল বুক’-এ। বর্ণময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোচবিহার এন এন পার্কে এই পুস্তিকাটির উদ্‌বোধন করেন রাজ্যের বন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। উপস্থিত ছিলেন বনকর্তাসহ জেলা প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিরা।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

অরণ্য মিত্র

নবেন্দু মল্লিক নিশ্চিত ছিলেন যে শ্যামল আসলে একটা নেপালি মেয়ের সঙ্গে ভেগেছে। এখন মনে হচ্ছে খোঁজখবর রাখলেই ভাল হত। ছেলেটা সাত দিন হল নিখোঁজ। অন্য দিকে, জয়গাঁওয়ের হোটেলে বিজু প্রসাদ হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছিলেন, তখনই চঞ্চল থাপা তাঁকে জানায়, কুরিয়ার চলে গিয়েছে মানে চারটে মেয়ে দিল্লির ট্রেনে পাচার। এভাবেই কুরিয়ার প্যাকেটগুলো যাচ্ছে বছরের পর বছর। কিন্তু আচমকা বোসবাবুর বদলে দাসবাবু চলে আসায় তাঁরই মুখে কেন খুন করার দরকার পড়ল শুনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও চুপ থাকতে হয় বিজু প্রসাদকে। ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে চলেছে এমনই অনেক উত্তেজক এবং রুদ্ধশ্বাস ঘটনার মধ্যে দিয়ে। আর সেইসব ঘটনার পরতে পরতে ফুটে উঠছে অন্ধকার ডুয়ার্সের ছবি।

১০

দু'রাত্রি 'গ্রিন টি' রিসর্টে উদ্দাম শরীরী জীবন কাটিয়ে তৃতীয় দিন রাম মিশ্র রিসর্ট ছাড়লেন সকাল সাড়ে ছ'টায়। কথা ছিল দুপুরের পর বার হবেন। কিন্তু সুষমা 'চুড়েল কি টিলা' দেখবে বলে আবদার করেছিল। বিনিময়ে অবশ্য শয্যায় ভেলকি দেখিয়েছে। রাম মিশ্রর জীবনে সুষমাই এ পর্যন্ত সেরা মেয়ে। তাকে দিনকয়েক শিলিগুড়িতে নিজের ছোট ফ্ল্যাটে রাখবেন কি না ভাবছিলেন। দু'দিকে গাছপালা আর বাঁশবন ভেদ করে গাড়ি চলছিল। হালকা কুয়াশাও আছে। 'চুড়েল কি টিলা' দেখতে হলে তাকে এই রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে একটু একটু করে উঠতে হবে। নদী অবশ্য পার হতে হবে। তার ঠিক আগেই একটা ছোট বাঁকের মুখে পেল্লায় একটা পাথর খাড়া হয়ে আছে। সেটাই চুড়েল কি টিলা। রাম মিশ্র এর নাম আগে শোনেননি। ডুয়ার্সের কত স্পট রোজ রোজ বার হচ্ছে হনুমানজিই জানেন! রাম মিশ্রর তাতে দরকার নেই। সুষমার আবদার মেটাতেই যাচ্ছেন তিনি। গত দু'দিনের শরীর-খেলার মৌতাত এখনও কাটেনি তাঁর।

গাড়ি সুষমাই চালাচ্ছিল। দিব্যি হাত। রাস্তার অবস্থা তেমন ভাল নয়। উলটো দিক থেকে একটা বাইক এলে হিসেব করে সাইড ছাড়তে হচ্ছে। যদি কোনও গাড়ি আসে, তবে সমস্যা। সুষমা কিন্তু নিশ্চিন্তেই চালাচ্ছিল। সিনেমার হিরোইনের মতো লাগছিল তাকে। দূরে জলঢাকার আভাস দেখা যাচ্ছিল। কুয়াশার কারণে পাহাড় অদৃশ্য। তবুও খুব সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা। রাম মিশ্রর মনে হচ্ছিল রাজেশ খান্নার সিনেমার কথা। সুষমা ট্র্যাক সুটের পাজামার মতো প্যান্ট আর হলুদ উইন্ডচিটার পরেছিল। কপালে হলুদ উলের টুপি। নায়িকা হয়ে গাড়ি চালানোর পক্ষে পোশাক যথেষ্ট বেশি। রাম মিশ্র যথাসম্ভব স্বল্পবেশে কল্পনা করছিলেন সুষমাকে। অবশ্য এটাও ভাবছিলেন যে, এই শীতে অত কম পোশাকে সুষমার ঠান্ডা লেগে যাবে।

তখনই সুষমা একবার তাকাল রাম মিশ্রর দিকে। তার হাসিতে রাম মিশ্র গলে গেলেন। সুষমা টের পেল সে কিছু বলতে চায়। জিজ্ঞেস করল, 'ওয়ানা সে সামথিং? কুছ বোলেগা?'

'আমার সঙ্গে দো দিন শেলিগোড়ি থাকো।'

'শিলিগুড়ি?' সুষমা আবার হাসল। 'বেটার টু লিভ অ্যানাদার প্লেস টুগেদার। ভাল জায়গা আছে। কয়েকদিন থাকব।'

'কোথায়?'

'তার আগে এটা দেখো ডার্লিং।' গাড়িটা থামিয়ে সুষমা মোবাইলটা হাতে নিয়ে বুড়ো আঙুল বুলিয়ে দিল কয়েকবার। এর পর এগিয়ে দিল রাম মিশ্রর দিকে।

'য়ু উইল এনজয় ইট।'

সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি স্ক্রিনে একটা ভিডিয়ো চলছে। রাম মিশ্র ছবি দেখে চমকে গেলেন। বিছানায় দু'টি নারী-পুরুষ আদিম খেলায় মত্ত। দু'জনকেই রাম মিশ্র বিলক্ষণ চেনেন। তিনি আর সুষমা। গ্রিন টি রিসর্টের নরম বিছানায় এলইডি-র নরম কিন্তু উজ্জ্বল আলোয় চিনতে কোনও অসুবিধাই হচ্ছিল না নায়ক-নায়িকাদের।

'তু-তুম ভিডিয়ো শুট কিয়া?'

গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। রাম মিশ্রর স্তম্ভিত মুখের দিকে না তাকিয়েই সুষমা বলল, 'আজকাল লা-জবাব সব স্পাই ক্যাম বেরিয়েছে ডার্লিং। এটা আমার হ্যান্ডব্যাগের বাইরের পকেটে পেন হিসেবে রাখা থাকে। ভেরি সিম্পল। এইচডি কোয়ালিটির ভিডিয়ো।'

'মগর কিউঁ?'

'স্পটে গিয়ে বলছি ডার্লিং। এসে গিয়েছি।'

গাড়ির স্পিডটা একটু বাড়িয়ে মিনিট পাঁচেক চলল সুষমা। রাম মিশ্র হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে, এই গোটা রাস্তাটা তিনি একটাও

রাম মিশ্রর কান্না পেল। একটু আগেও তিনি কত অনায়াসে সুষমাকে নানারকম স্বল্প পোশাকে কিংবা বিনা বস্ত্রে কল্পনা করছিলেন। এই মুহূর্তে সেসব অলীক। তাঁর কল্পনায় কেবল হনুমানজির মূর্তি ভেসে উঠছিল। সুষমার শরীরেই হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে হনুমান চালিশা আওড়াতে লাগলেন রাম মিশ্র। সুষমা দেখল।

মানুষ দেখেননি। দু'পাশে জঙ্গল ঘন হয়ে এসেছে। রাস্তাটা একটা বাঁকের সামনে এসে একদিকে প্রায় সত্তর ডিগ্রিতে ঝাঁপ দিয়েছে অনেকটা নিচে। আরেকটা দিক একটু ঢালু হয়ে ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছে নদীর মধ্যে। বাঁকের এক কোণে একটা ফুট দশেক উঁচু লম্বাটে পাথর।

'এটাই কি চুড়েল কা টিলা?'

গাড়ি থামাল সুষমা। রাম মিশ্র নামলেন। তাঁর হাতে তখনও সুষমার ফোনটা ধরা। ভিডিয়োতে নিরন্তর বয়ে চলেছে গত দু'দিনের নানান রতিক্রিয়ার কোনও একটি অংশ। শীৎকারের শব্দ নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন হিসহিস করেছে।

'এটাই সেই চুড়েল টিলা?' রাম মিশ্র ভ্যাবলার মতো জিজ্ঞেস করলেন। নদীর দিক থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ পেলেন তিনি তখনই। তাকিয়ে দেখলেন একটা লাল রঙের বোলেরো গরগর করতে করতে উঠে আসছে। রাম মিশ্র অবাক চোখে দেখলেন, বোলেরোটা ঠিক তাঁর একটু আগে এসে থামল। মাফলারে মুখ ঢাকা তিনটে লোক লাফিয়ে নামল। রাম মিশ্র কোনওরকম বাধা দেওয়ার আগেই লোকগুলো তাঁকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল বোলেরোর মধ্যে। পিছনের সিটের মাঝামাঝি তাঁকে বসিয়ে দেওয়ার পর তিনি চেঁচাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাশের লোকটা তাঁর কোমরে একটা পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁকে চুপ করিয়ে দিল। একজন বসেছে স্টিয়ারিং-এ। রাম মিশ্রর আরেক পাশ খালি।

সুষমা সেই খালি জায়গাটা দখল করে রাম মিশ্রর আতঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একসঙ্গেই থাকব ডার্লিং! তবে শিলিগুড়িতে না।'

তৃতীয় ব্যক্তিটি রাম মিশ্রর গাড়িটার দখল নিয়েছে। সেটাকে পিছনে রেখে লাল বোলেরোটা বেশ একটু ঝুঁকি নিয়েই গতি বাড়িয়ে ফিরতে শুরু করল সরু কাঁচা পথ ধরে। রাম মিশ্র পুতুলের মতো নিস্পন্দ হয়ে বসে ছিলেন।

'ওনলি সেভেন্টি ফাইভ লাখস ডার্লিং!' সুষমা রাম মিশ্রর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'না হলে কোনও একটা পাহাড় থেকে তোমাকে ফেলে দিয়ে এই ভিডিয়ো ফাঁস করে দেব। ফ্যামিলি জানবে ভিডিয়ো ফাঁস হওয়ায় সুইসাইড করেছ।'

রাম মিশ্রর কান্না পেল। একটু আগেও তিনি কত অনায়াসে সুষমাকে নানারকম স্বল্প পোশাকে কিংবা বিনা বস্ত্রে কল্পনা করছিলেন। এই মুহূর্তে সেসব অলীক। তাঁর কল্পনায় কেবল হনুমানজির মূর্তি ভেসে উঠছিল।

সুষমার শরীরেই হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে হনুমান চালিশা আওড়াতে লাগলেন রাম মিশ্র। সুষমা দেখল। তার মুখে ফুটে উঠল তাচ্ছিল্যের হাসি। একটু পরেই কাঁচা রাস্তা থেকে বেরিয়ে জাতীয় সড়কগামী গ্রামীণ পাকা রাস্তায় গিয়ে পড়ল গাড়িটা। তারপর ছুটতে লাগল হু হু করে।

১১

জয়গাঁওতে বিজু প্রসাদকে আরও সাবধানে কাজ করার জন্য পরামর্শ দিয়ে দাসবাবু চলে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। সেই রাতেই। রাজাভাতখাওয়ার কাছে একটা ভাল হোটেল বুক করা ছিল। দাসবাবু সেখানে দু'দিন হল আছেন। বিজু প্রসাদ তাঁকে বাঙালি ভাবলেও তাঁর নাম আসলে কৃষ্ণদাস সারোগি। বোসবাবুর বয়স হয়েছে। শরীরও ভাল নয়। তাই দিল্লি থেকে তাঁকে বিশ্রামে পাঠানো হয়েছে সুইটজারল্যান্ডে। তাঁর এলাকা এসে পড়েছে দাসবাবুর ঘাড়ে। তবে তিনি ডুয়ার্সে এসেছেন অন্য কারণে। রাজা রায় নামক একজনের সঙ্গে তাঁর ডুয়ার্সের কয়েকটা স্থানের কোনও একটিতে দেখা হওয়ার কথা এই ডিসেম্বরেই। একটু অনুমানের উপর সেই জায়গাগুলো দু'চার দিন করে থাকছেন তিনি। রাজা রায়ের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি।

ভারত-ভুটান যৌথ অভিযানের পর কেএলও জঙ্গিদের কোমর প্রায় ভেঙে যায়। দলটা টুকরো টুকরোভাবে টিকে আছে বিভিন্ন জায়গায়। কোনও টুকরো আত্মসমর্পণ করেছে। কেউ কেউ আলাপ-আলোচনা চালাতে চাইছে। একটা অংশ মিশে গিয়েছে অপরাধের সঙ্গে। অপরাধ থেকে টাকা জোগাড় করে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চায় তারা। রাজা রায় তাদেরই একজন। দুর্দান্ত যোগাযোগ। নেপালের মাওবাদী থেকে চিনের অস্ত্র ব্যবসায়ী— সবখানেই অবাধ যাতায়াত। বর্মা জঙ্গিদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল।

এই রাজা রায় একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। চিন থেকে এমন কিছু ডিভাইস পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সম্ভব, কিন্তু সরকার আর পুলিশ কিচ্ছু টের পাবে না। ব্যবহারও খুব সোজা। মোবাইলের মতোই। ডিভাইসগুলোর দাম বেশি নয়, কিন্তু যে নেটওয়ার্কে যোগাযোগ থাকবে তা কিনতে অন্তত আড়াই কোটি টাকা লাগবে শুরুতে। দাসবাবুর বেশ ভাল লেগেছিল ব্যাপারটা। মোবাইলে যোগাযোগ করা জল-ভাত, কিন্তু কল লিস্ট আর জিপিএস দিয়ে পুলিশ একটা মোবাইল থেকেই অনেক কিছু ঘটিয়ে দিতে পারে। অন্যের নামে সিম বানিয়ে কিছুটা সামাল দেওয়া গেলেও দাসবাবু মোবাইল ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করেন না। তাই চিনা কোম্পানির লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হয়েছেন। এদিককার জঙ্গি দলগুলি চিন থেকে নানারকম প্রযুক্তিগত সাহায্য পায়। এফএম স্টেশন বসিয়ে লাগাতার ভারত বিরোধী প্রচার করে। ভায়া নেপাল সেসব চ্যানেল ডুয়ার্সে এফএম সেটগুলোতে গমগমে আওয়াজ নিয়ে বাজে। দাসবাবুর ইচ্ছে আছে, যোগাযোগের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি কয়েকটা ভাল রিভলভার চিনের লোকগুলোর সূত্রে পাওয়া যায় কি না।

হোটেলের নীচতলায় রেস্তরাঁ কাম বার-এ এক কোণে বসে ছিলেন দাসবাবু। বেজায় ঠান্ডা পড়েছে। হোটেলবাসীদের অধিকাংশই পর্যটক। পরদিন সকাল সকাল বার হবেন বলে তারা সব ঘরে সেঁধিয়ে গিয়েছে। সুরাপ্রেমী কয়েকজন ইতিউতি ছড়িয়ে ছিল কেবল। দাসবাবু এক পাত্র ভাল হুইস্কি নিয়ে চুপচাপ সময় কাটাচ্ছিলেন। চিনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য রাজা রায় একটা শর্ত দিয়েছিল। অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তারা কোথাও একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে চায়। তার জন্য জরুরি ভিত্তিতে টাকা জোগাড় করতে হবে তাদের। বিস্ফোরণ বেশ জোরদার হবে। ডুয়ার্সের কয়েকটা জায়গায় একই দিনে ঘটবে সেসব। এই পদ্ধতিতে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করলে পুরো ব্যাপারটা জলে যায় না। একটা মিস হলে আরেকটা ফাটেই।

কিন্তু এর জন্য অন্তত পঞ্চাশ লাখ টাকার বন্দোবস্ত থাকা চাই। রাজা রায়ের প্রস্তাব ছিল, দাসবাবুর লোকেরা শিলিগুড়ির একটা ব্যবসায়ীকে তুলে আনুক। তাকে লুকিয়ে রাখার কাজটা রাজা রায়ের দল করবে। ডুয়ার্স আর ভুটান সীমান্তের জঙ্গলের বহু গোপন স্থান তাদের জানা। পুলিশ তার অধিকাংশেরই খবর জানে না। ব্যবসায়ীদের একটা ছোট তালিকাও দিয়েছিল রাজা রায়।

দাসবাবু শর্তটা মেনে নিয়েছিলেন। রাম মিশ্রকে শিলিগুড়ি থেকে ফাঁদ ফেলে ডেকে

আনার কাজটা সুষমা দারুণ নামিয়েছে। ব্যাটা ব্যবসায়ী ফেঁসেছে জব্বর। মেয়েদের নেশা থাকলে লোককে ফাঁদে ফেলা মামুলি ব্যাপার। দাসবাবু এটাও জেনেছেন যে, রাম মিশ্র যাট লাখ দিতে রাজি হয়ে গিয়েছে। আরেকটু বাড়িয়ে ডিলটা সেরে ফেলবে সুষমারা।

তখনই সিরাজুল হককে দেখলেন দাসবাবু। ছোটখাটো চেহারার সিরাজুলকে অনেকদিন পরে দেখলেন তিনি। সে গুণের মানুষ। কোচবিহার-বাংলাদেশ সীমান্তে রাজত্ব চালায়। কাফ সিরাপ চালান করার দারুণ নেটওয়ার্ক। ভারত এবং বাংলাদেশ— দুই জায়গাতেই ভোটার লিস্ট আর রেশন তালিকায় সিরাজুলের নাম আছে। দাসবাবুর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। সিরাজুলকে পছন্দ করেন তিনি। একবার সময়মতো একটা খবর দেওয়ায় বাংলাদেশ থেকে এগারোটা মেয়েকে নিয়ে এপারে আসা দলটা ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। মেয়েগুলোকে পাওয়া যায়নি, কিন্তু ধরা পড়ে গেলে ঝামেলা ছিল দাসবাবুর।

সিরাজুল সামনের দিকে একটা টেবিল পছন্দ করে বসতে যাচ্ছিল। দাসবাবু তাকে ওয়েটারকে দিয়ে ডাকিয়ে আনলেন। সিরাজুল নিজেও ভাবেনি দাসবাবুর কথা। সে রীতিমতো অবাক হয়ে বলল, 'দাসবাবু না? আসলাম আলেইকুম।'

'বোসো সিরাজুল। তুমি এই হোটেলে?'

সিরাজুলের অতি সাধারণ পোশাক দেখে বোঝার উপায় নেই সে ঢাকায় দুটো মার্সেডিজ ভাড়া খাটায়। আজ দুপুরেই হোটেলের ঘরে টিভিতে দাসবাবু দেখছিলেন যে, গতকাল তিন হাজার বোতল কাফ সিরাফ ধরা পড়েছে। সিরাজুলকে দেখার পর সেটা মনে পড়ছে তাঁর।

'ধান্দা আছে দাদা!' সিরাজুল ওয়েটারকে রাম দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলে, 'আপনারে অনেকদিন পর দেখলাম।'

'খবরে দেখলাম অনেক সিরাপ ধরা পড়েছে। ধরা দেওয়ালে নাকি?'

সিরাজুল হাসল। বলল, 'দেওয়াইলাম ধরা। বিএসএফ, পুলিশ সবাই কয়, উপরতলা থিইক্যা চাপ আছে। ধরা খাওয়াও। খাওয়াইলাম। জালি মাল। ধরা খাওয়ানোর জন্য এই মালেরও গোডাউন বানাইতে হইতেসে।'

খ্যা খ্যা করে হেসে কথাটা শেষ করল সিরাজুল হক।

১২

নবেন্দু মল্লিক ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। শ্যামলের ফোন কেন সন্ধেবেলায় ক্রান্তির রাস্তায় অফ হয়ে গিয়েছে, তার ব্যাখ্যা সে নেপালি মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা দিয়ে মেলাতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, শ্যামল কোনও নেপালি মেয়ের ট্র্যাপে পড়েছে। কিন্তু শ্যামলের মতো ছেলেকে একটা নেপালি মেয়ে ট্র্যাপে ফেলবেই বা কেন? নবেন্দু মল্লিক স্পষ্ট কোনও উত্তর পাচ্ছে না। ঘটনাবলি বিচার করে তার মনে হয়েছিল, পুলিশকে ভাল করে তদন্তের জন্য চাপ দেবে। প্রেস কনফারেন্স করে শ্যামলকে খুঁজে বার করার জন্য সিবিআই দাবি করবে। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে থানায় ফোনও করেছিল নবেন্দু মল্লিক। কিন্তু সে দিন বিকেলেই কলকাতা থেকে বুদ্ধ ব্যানার্জির ফোন এল। তার বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত। নবেন্দুকে কোণঠাসা করার জন্য আরেক গোষ্ঠী ঘোঁট পাকাচ্ছে। এই অবস্থায় কাশীপুরের ছেলেটির হারিয়ে যাওয়া নিয়ে হইচই হলে পরিস্থিতি নবেন্দুর বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে।

বুদ্ধ ব্যানার্জি মন্ত্রী নন। তিনি কেবল একজন বিধায়ক। প্রায়ই তাঁকে সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে সহাস্য অবস্থায় কাগজে টিভিতে দেখা যায়। 'সরল মানি' নামক আর্থিক কেলেঙ্কারিতে তিনি জেলে যাবেন ভাবা গিয়েছিল। তার কোনও লক্ষণ নেই। জেলায় তাঁর নেটওয়ার্ক সাংঘাতিক। নবেন্দু মল্লিকের উত্থানের পিছনে বুদ্ধ ব্যানার্জির স্নেহের হাতের কথা অনেকেই জানে। নবেন্দু মল্লিক নিজেও তা মনে রাখে প্রতি মুহূর্তে। সেই কারণে শ্যামলের ব্যাপারে আবার থানায় বলেছে সিরিয়াস না হতে। ধূপগুড়ি থানার ইন-চার্জ মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'কেন স্যার? কেসটায় কিছু প্রবলেম আছে নাকি?'

এর পরই গতকাল কাশিয়াগুড়ির যতীন মোহন হাই স্কুলের মাঠে শীতকালীন মেলার মিটিং-এর মতো সাধারণ ঘটনায় অজ্ঞাত কারণে প্রথমে গোলমাল, পরে হাতাহাতি শেষে বোমা ছোড়াছুড়ি হয়েছে। দু'জন হাসপাতালে। মারপিট করা দু'পক্ষই নবেন্দু মল্লিকের দলের ছেলে। এইরকম গোলমাল হয় কী করে? ঘটনার পর মিডিয়াতে জোর প্রচার হচ্ছে। গোলমালের ভিডিয়ো, বোমাবাজির ভিডিয়ো দেখানো হচ্ছে। সাংবাদিকগুলো কি আগে থেকেই জানত নাকি এসব? তার কাছে খবর আসে, দুটো চ্যানেলের লোক নাকি ক্যামেরা আর মাইক নিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে ফোনে বারবার কথা বলছিল।

বুদ্ধ ব্যানার্জির লোক আর আসেনি। কিন্তু ঘটনাটা ভাববার। তা ছাড়াও গতকাল থেকে কোনও মিডিয়া তার কোনও বক্তব্য জানতে চায়নি। গিফ্‌ট নেওয়ার সময় তো সব ক'টা এসে হামলে পড়ে। নিউ ইয়ার পড়ে গেলেই আসবে ডায়েরির জন্য। মাঝেমধ্যে দু'-চারটে নিরামিষ খবর চেপে দেয় বলে এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য হয় না নবেন্দু মল্লিকের।

তখনই একটা ফোন এল। নবেন্দু মল্লিক দেখলে, সেটাও একটা সাংবাদিকের নম্বর। বিটি টিভি। নবেন্দু মল্লিক আজ পর্যন্ত টিভি চালিয়ে এই চ্যানেল খুঁজে পায়নি। কলকাতায় নাকি বাড়িতে বাড়িতে চলে। সেট টপ বক্স লাগালেই চলে আসবে। বালের চ্যানেল!

তবুও ফোনটা ধরে নবেন্দু মল্লিক বিরস মুখে বলল, 'হ্যাঁ বলুন।'

'কাশিয়াবাড়ির ব্যাপারটায় কিছু বলবেন?'

'টিভিতে ভিডিয়োও দেখাচ্ছে। আপনার কলিগরা কি আগে থেকে সব জেনে ওখানে ছিপ ফেলে বসে ছিল?'

'এসব কি অফিশিয়ালি বলছেন?'

'ন্যাকামো মাড়াবেন না তো! সে দিন যখন কম্বল বিতরণ করলাম, তখন কেউ এলেন না। আর কালকে মেলার মিটিং-এর মতো পাতি ব্যাপারে আপনারা আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকলেন?'

'ওইটা তো ইনসিডেন্ট। কয়েকজন গাড়ির ধাক্কায় বাইসনের মারা যাওয়ার কেস কভার করে ফিরছিল। ইনসিডেন্টালি কাশিয়াবাড়িতে এসে বোমাবাজির সামনে পড়ে যায়।'

'আপনারা ডেমোক্র্যাসির চার নম্বর পিলার। যা বলবেন, মেনে নিতেই হবে।' নবেন্দু মল্লিক নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর স্বরে তার বক্তব্য জানায়, 'কাশিয়াগুড়ির ঘটনাটা বিরোধী পক্ষের চক্রান্ত। ওরাই গোলমাল লাগিয়ে বোমাবাজি করেছে। এতদিন মেলাতে স্টলগুলো থেকে জোর করে টাকা আদায় করা হত। আমরা সেসব বন্ধ করেছি। এই কারণেই হামলা।'

'ওকে।'

সাংবাদিক লাইন কেটে দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত আধ ডজন টিভি চ্যানেলের লোক এল নবেন্দু মল্লিকের কাছে। তাদের সামনে বক্তব্যটা আরেকবার বলতে হল। দুপুরের পর থেকেই ভাল ভাল কয়েকটা চ্যানেলে প্রচারিত হতে শুরু করল সেই বক্তব্য। সন্ধে নাগাদ সেই বক্তব্যের উপর আলোচনাসভা বসিয়ে দিল দুটো চ্যানেল। দলের বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা ফোনে অভিনন্দন জানালেন নবেন্দু মল্লিককে। একটু রাতের দিকে এসএমএস এল বুদ্ধ ব্যানার্জির। তিনি লিখেছেন, 'গুড স্টেটমেন্ট। তোমার অপোনেন্ট লবি জোর ধাক্কা খেয়েছে।'

ফলে অনেক রাত পর্যন্ত ইয়ারদোস্তদের নিয়ে ফুর্তি করল নবেন্দু মল্লিক। হুইস্কির ঘোরে তার এক সময় মনে হল যে, এই ঘটনার ফলে শ্যামলের কেসটা লোকের মাথা থেকে সরে গেল। কেউ বোধহয় নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য পাকিয়ে দিয়েছে গোলমালটা। কিন্তু কেন?

অস্বস্তিটা নিয়েই শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল নবেন্দু মল্লিক।

(ক্রমশ)

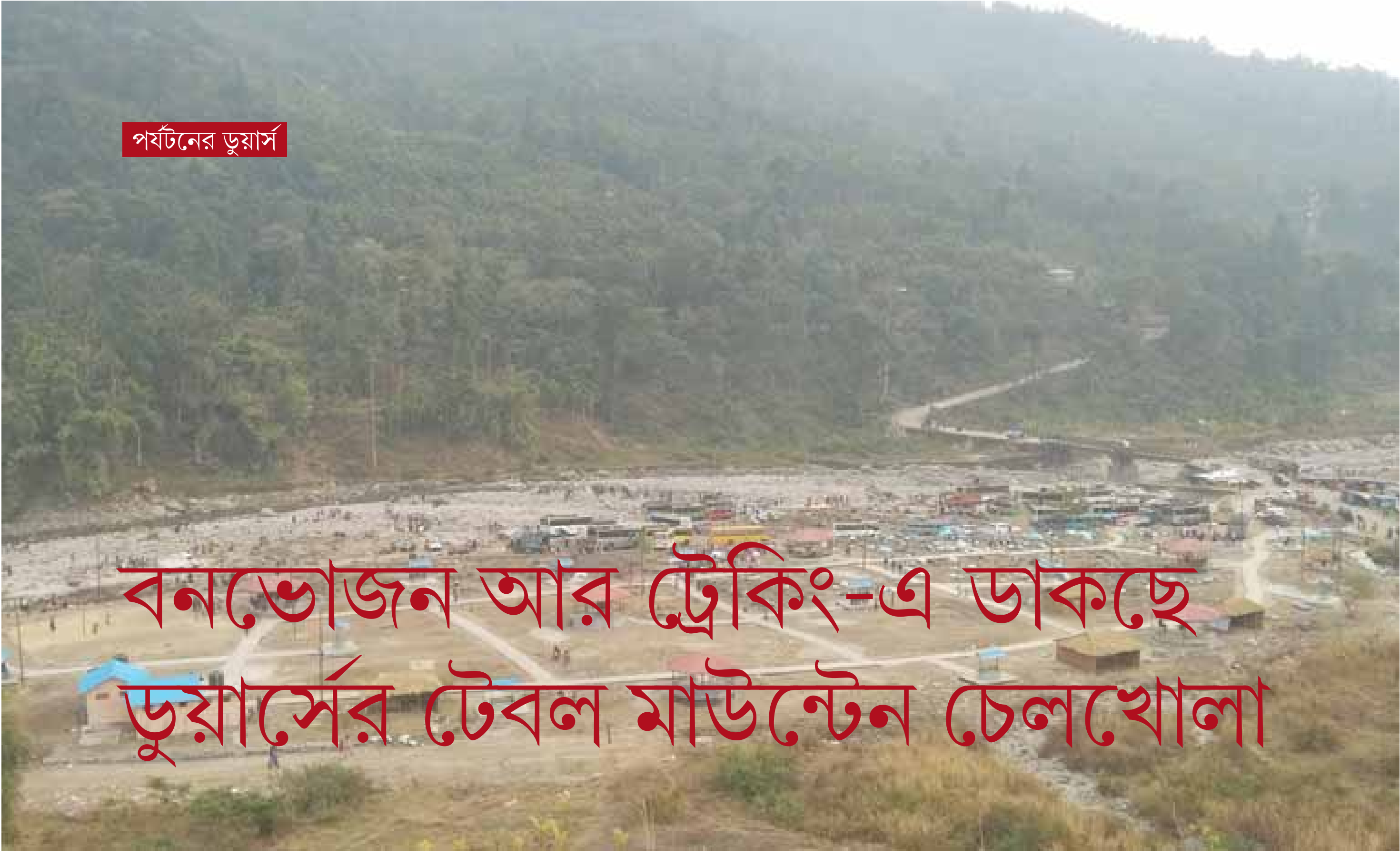

বনভোজন আর ট্রেকিং-এ ডাকছে ডুয়ার্সের টেবল মাউন্টেন চেলখোলা

শিলিগুড়ি বা মালবাজার থেকে ডামডিম হয়ে যে পথটি লাভা চলে গিয়েছে, সেই পথে গোরুবাথান পেরিয়ে কয়েকটি বাঁক ঘুরতেই রাস্তার বাঁ দিকে চোখে পড়বে আপার ফাগু চা-বাগান নামাঙ্কিত পাকা সিমেন্টের বোর্ড, যার পাশ থেকে একটা পিচের রাস্তা উতরাই বেয়ে সোজা চেল নদীর দিকে নেমে গিয়েছে। যেন হঠাৎ ঝপ করে লাফিয়ে পড়েছে নদীর ধারে। তারপর নদীর উপরের লোহার সেতু পেরিয়ে আবার একের পর এক চড়াই ভাঙতে ভাঙতে আপার ফাগু চা-বাগানের বুক চিরে চলে গিয়েছে ঝান্ডির দিকে। তবে আজ আমাদের গন্তব্য ঝান্ডি নয়, চেলখোলা। অর্থাৎ চেল নদীর উপরের সেতু পেরিয়েই ডান দিকে যে মনোরম পিকনিক স্পটটি রয়েছে, সেটি। পিকনিকের জন্য একেবারে আদর্শ পরিবেশ হল চেলখোলা। পাহাড়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে বয়ে চলা চেল নদীর পূর্ব দিকে উঠে গিয়েছে খাড়া পাহাড়। ঠিক তার উলটো দিকে নদীর পশ্চিমে কিছুটা পাথুরে এবং কিছুটা সমতল জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে চেলখোলা পিকনিক স্পট।

ডুয়ার্সের স্থায়ী বাসিন্দা, বিশেষ করে পশ্চিম ডুয়ার্সের মানুষের কাছে গোরুবাথানের চেলখোলা বহুদিন ধরেই বনভোজনের জন্য আকর্ষণীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হলেও বছর পাঁচেক আগেও ডুয়ার্সের বাইরের মানুষ বা পর্যটকদের কাছে জায়গাটি ততটা পরিচিত ছিল না। কারণ প্রচারের আলো কোনও দিন এই জায়গার উপরে পড়েনি। টিভির পর্দা কিংবা পত্রপত্রিকার পাতাতেও সেভাবে জায়গা পায়নি পশ্চিম ডুয়ার্সের অন্যতম সেরা এই পিকনিক স্পটটি। তাই ভ্রমণপ্রিয় অসংখ্য বাঙালির কাছে অজানাই থেকে গিয়েছিল চেলখোলার অপরূপ সৌন্দর্য। তবে যাঁরা একবার এখানে এসেছেন, তাঁরাই কিন্তু গোরুবাথানের চেলখোলার কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছেন। মুখে মুখে প্রচারিত রূপসি চেলখোলার কথা শুনেই বোধহয় বিগত কয়েক বছর যাবৎ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহর থেকে বনভোজনপ্রিয় উৎসাহী মানুষের দল শীতের মরশুমে ভিড় জমাচ্ছিলেন চেল নদীর পাড়ে। তবে আশার কথা, চেলখোলাকে একটি আদর্শ পিকনিক স্পট হিসেবে গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছে স্থানীয় প্রশাসনও। নদীর পাড়ের সমতল জায়গায় বানানো হয়েছে মাথায় লাল ও নীল রঙের ছাউনি দেওয়া চারদিক উন্মুক্ত বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য বসার জায়গা। কোনওটা বৃত্তাকার, কোনওটা আবার লম্বা। আর তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলাচলের জন্য তৈরি করা হয়েছে সিমেন্ট কংক্রিটের ঢালাই করা সরু পথ। তৈরি হয়েছে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচালয়। চেলখোলায় বনভোজন করতে বা বেড়াতে আসা উৎসাহীরা চাইলে এখানে ছোটখাটো ট্রেকিংও করে ফেলতে পারেন। কারণ, পিকনিক স্পটের জন্য সাজানো সমতল জায়গাটি পেরলেই রয়েছে প্রায় চারশো ফুট উঁচু একটি খাড়া পাহাড়। যদিও পাহাড়ের মাথাটি আবার একদম সমান। দক্ষিণ আফ্রিকার টেবল মাউন্টেনের মতো, যাকে বলা যেতে পারে ডুয়ার্সের টেবল মাউন্টেন! আপার ফাগু যাবার রাস্তা ধরে কিছুটা চড়াই ভাঙলেই ডান দিক দিয়ে একটি পায়ে-চলা পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গিয়েছে ওই খাড়া পাহাড়ের মাথায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সামনের স্রোতস্বিনী চেল নদী এবং তার পাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া আপার ফাগুর রাস্তা ধরে কিছুটা এগলেই রয়েছে এক বৌদ্ধ স্তূপ। চাইলে সেই স্তূপের চারধারে প্রদক্ষিণ করে প্রিয়জনের মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা করে আসতে পারেন। সেখান থেকে কয়েক পা এগলেই আপার ফাগু চা-বাগান। পাহাড়ের গা বেয়ে একের পর এক সারিবদ্ধ চা-গাছ সুশৃঙ্খল ছাত্রছাত্রীদের মতো হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখান দিয়ে পিচ-ঢালা রাস্তা ক্রমাগত ইউ-টার্ন করে এঁকেবেঁকে উঠে গিয়েছে অনেকটা উঁচুতে।

চেলখোলার পাড়ে ঘুরে বেরিয়ে ডুয়ার্সের টেবল মাউন্টেন থেকে মোহময় প্রকৃতির সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করে, আপার ফাগুর চা-গাছের সঙ্গে সেল্‌ফি তুলে ফিরে আসবার সময় আপনাকে বলতেই হবে— চেলখোলা, আবার আসব গো তোমার কাছে।

সুধাংশু বিশ্বাস

সুস্মিতা চন্দ

গোড়ালি ও ঠোঁটের যত্নে ঘরোয়া টিপস

গোড়ালি ফাটা

শীতের দিনে, বিশেষ করে শীত পড়বার সময় আর শীত শেষ হওয়ার সময় গোড়ালি ফাটা এক সাধারণ সমস্যা, যা বাড়তে দিলে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তাই প্রথম থেকেই সচেতন থাকলে এর থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে অনায়াসে।

১) প্রতিদিন স্নানের আগে কয়েক ফোঁটা তিল তেল নিয়ে পায়ে ভাল করে মাসাজ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

২) রাতে শুতে যাওয়ার আগে ঈষৎ গরম জলে অল্প নুন বা শ্যাম্পু মিশিয়ে ২০ মিনিট পা ডুবিয়ে রেখে, তারপর মুছে নিয়ে একটু লোশন বা ক্রিম লাগিয়ে নিলে পা খুব ভাল থাকে। গরম জলে গোড়ালির মৃত কোষগুলিকে নরম করতে সাহায্য করে।

৩) চালের গুঁড়ো, টক দই পেস্ট করে প্যাক তৈরি করে গোড়ালিতে লাগিয়ে রাখতে হবে। শুকিয়ে গেলে ক্লকওয়াইজ এবং অ্যান্টিক্লকওয়াইজ বারকয়েক ঘষে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। এরকম সপ্তাহে তিন দিন করা যেতে পারে।

ঠোঁটের সমস্যা

শীতে ঠোঁট নিয়েও আমাদের ভোগান্তির শেষ নেই। ঠোঁট ফেটে যাওয়া, ঠোঁটে কালো দাগ পড়া— এসব সমস্যা লেগেই থাকে। এর থেকে বেরিয়ে আসার কয়েকটি উপায়—

১) ঠোঁট-ফাটা থেকে মুক্তি পেতে ঠোঁটে মধু লাগাতে হবে সপ্তাহে তিন দিন।

২) রাতে শুতে যাওয়ার সময় আমন্ড অয়েল লাগালেও ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

৩) মুখ ধোয়ার পর একটি নরম তোয়ালে দিয়ে ঠোঁট মুছে নিলে ঠোঁটের মৃত কোষগুলি অনেকটাই চলে যায়।

৪) মধু, দুধের সর আর চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে ঘষলে কালো দাগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই।

পৌলোমী গঙ্গোপাধ্যায়, হ্যামিলটনগঞ্জ

বসন্ত এসে গেছে

শীতের মায়া যে এবার ছাড়তে চাইছে না ডুয়ার্স। সরস্বতী পুজোতেই নাকি বসন্তের হাওয়া প্রথম পারমিশন পায় বইবার। ভ্যালেন্টাইন'স ডে নাকি তারই সূচনালগ্ন উদ্‌যাপন! কলেজে পড়া যে কিশোরীটি হিল্লোল তুলে এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিল, তার হরিণী উচ্ছলতায় মুগ্ধতা জাগে ঠিকই, কিন্তু তবু বুকের এক কোণে আশঙ্কার মেঘ দুরুদুরু কাঁপে— শেষ অব্দি সুরক্ষিত থাকবে তো এই কুঁড়িটি? শ্বাপদরা আজ যে অবাধে ঘুরে বেড়ায় অলিগলিতে, বাড়ির উঠোনে আনাচকানাচে! রক্ষীরা সব উদাস মুখে খইনি ডলে— সম্ভবত ঈশ্বর কবে ঘুম থেকে উঠবেন, তারই প্রতীক্ষায়। কামদুনি-কান্না তাঁর কানে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল কি না জানা নেই, কিন্তু বিচারের বাণী খবরের কাগজের প্রথম পাতা ভরালেও তা কি বল আনতে পেরেছে ধূপগুড়ির সেই মায়ের বুকে? সবজিমাচার নীচ থেকে উদ্ধার করা পাড়ার কিশোরীটির বিক্ষত লাশের ছবি কি এ জন্মে ভুলতে পারবে গাঁয়ের মানুষ?

এবার সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দিতে গিয়ে একান্তে দেবীমূর্তির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে মনে হয়েছিল, এই দেবীর স্রষ্টাও তো শুনেছি পুরুষকুল থেকেই উদ্ভূত— তাঁদের সৃজনশীল সত্তার পিছনে কী করে লুকিয়ে থাকতে পারে আস্ত নারীখাদক, সেটাই বোধহয় এ যুগের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। সে দিনই হঠাৎ মনে জেগেছিল এক ভাবনা। আলের ধারে শনাক্তকরণের অপেক্ষায় পড়ে থাকা তরুণীর গলতে-শুরু-শব সবার অলক্ষ্যে একটি প্রশ্ন আজ বোধহয় অবহেলায় ছুড়ে দিতেই পারে সমগ্র পৌরুষ সমৃদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে। নেহাতই মাটির তৈরি, না হলে লক্ষ্মী-সরস্বতীও কি ওদের হাত থেকে রক্ষা পেত? ইয়ারফোনে মগ্ন আপাত-জগৎ-বিচ্ছিন্ন কন্যাদের চুপিচুপি পরামর্শ দিই, এই বেলা চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হবে বাপু— কার মনে কী বিষ আছে তা কে জানে বলো? কারণ বসন্ত এসে গেছে!

একার হাতেই সামলাচ্ছেন সংসার আর হোমস্টে

নিজের সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ছাড়াও প্রতিদিন হাসিমুখে পর্যটকদের সমস্ত আবদার মেটান তিনি। এর পর সবজি ও ফুলের বাগানের জন্য অনেকটা পাহাড়ি পথ হেঁটে যেতে-আসতে হয় তাঁকে। শুধু উপার্জনের জন্য নয়, যাতে তাঁর জন্মভূমি কুমাইয়ের কথা সবাই জানতে পারেন, তার জন্যই এত কিছু আনন্দের সঙ্গে করে যাচ্ছেন কলা থাপা।

যদিও কুমাই দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত, তবুও জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে প্রায় হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে বহুকাল ধরে। কুমাই বললে চা-বাগানের কথা আসবেই। কারণ, এই চা-বাগান আজও পর্যন্ত কোনও রাসায়নিকের সঙ্গে সখ্য পাতায়নি। বাগান পরিচর্যার সমস্তটাই অর্গ্যানিক, নো পেস্টিসাইডস। কুমাইতে গিয়েছিলাম কলা থাপার বাড়ি। পৌঁছানোমাত্র থাপা দম্পতির উষ্ণ অভ্যর্থনা। বারান্দায় বসে কফিতে চুমুক দিতে দিতে দেখছিলাম সামনে শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চা-জলখাবার থেকে শুরু করে পর্যটকদের পছন্দমতো লাঞ্চ এবং ডিনার তৈরি করা ছাড়াও আরও খুঁটিনাটি বহু কাজ। কলা তাঁর রোজনামচা বলছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভাবটা— এ আর এমন কী? আর পাঁচজন সাধারণ মহিলা নিজের ছোট্ট সংসার সামলাতেই হিমশিম খেয়ে যান। সেখানে নিজের সংসারটি সামলানোর পর প্রায় প্রতিদিন হাসিমুখে পর্যটকদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা— সত্যি ভাবা যায় না।

তাঁর বাড়িটিই টুরিস্টদের হোমস্টে। বাড়ির তিনটি ঘরই টুরিস্টদের জন্য সাজানো, বাকিটাতে নিজেরা থাকেন। স্বামী বিজয় থাপা বাড়িটিকে একটু পালটে এই হোমস্টের বন্দোবস্ত করেছেন। আর কলা হলেন কর্মী। হাটবাজার করার কোনও সুযোগ-সুবিধেই নেই ওই তল্লাটে। তাই বাড়ির পাশের ছোট্ট এক টুকরো জমিকে বানিয়েছেন কিচেন গার্ডেন। সেখানে থরে থরে হয়েছে সবজি গাছ, বেগুন, আলু, রাই শাক, স্কোয়াশ, কফি, আদা, লংকা ইত্যাদি। সমস্তটাই ফলেছে কলার নিপুণ হাতের কারিগরিতে। শুধু তা-ই নয়, সারা বাড়ি জুড়ে বেড়ে উঠেছে দারুণ সুন্দর সব গার্ডেন ফ্লাওয়ার, সাকুলেন্ট, ক্যাকটাস, মুসান্ডা, লালপাতা আর

ঝাউ গাছের বাহারি সৌন্দর্য। বুঝতে অসুবিধে হয় না, পরমুখাপেক্ষী না হওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য। ঝকঝকে তকতকে বাড়ির কোথাও কোনও অপরিচ্ছন্নতার লেশমাত্র নেই। তার আর-একটি কারণও অনস্বীকার্য যে, সেখানে বিষাক্ত ধোঁয়ার আনাগোনা নেই এখনও। ফলে মানুষগুলোও বড্ড সাদামাটা আর স্বচ্ছ। সবজিবাগান আর ফুলের গাছের জন্য কলাকে যেতে হয় বেশ খানিকটা পাহাড়ি পথ হেঁটে গোবর আনবার জন্য। এর পরও আছে মুরগি পালন। ডিম,মুরগি সবই পর্যটকদের কথা ভেবে। এভাবেই ফুরফুরে জীবন চালিয়ে যাচ্ছেন পঞ্চাশ ছুঁয়ে ফেলা কলা। যদিও তাঁর কর্মক্ষমতা আজও পঁচিশেই পড়ে আছে।

এরকম বহু মহিলাই আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন, যাঁরা মুখে বড়াই না করে দায়িত্ব পালন করে চলেন নীরবে। সংসারের দায়িত্ব, সেই সঙ্গে আরও কিছু। কুমাইতে নিজের বাড়িতে বসে হোমস্টে চালানোটা শুধুই কি অর্থ উপার্জনের জন্য? না, কুমাই তাঁর জন্মভূমি। সেখানে যদি মানুষজন আসা-যাওয়া করতে থাকেন, ধীরে ধীরে তাঁদের গ্রামটির উন্নতি হবে, গ্রামের মানুষরা উপার্জনের সুযোগ পাবে— এরকম করে ভাবতে পারেন শুধু কলা থাপা। তাই অন্তর থেকেই বলতে হয়— হ্যাটস অফ।

শ্বেতা সরখেল

মাকে হারিয়েছি কিন্তু অনেকের পাশে আছি

মাকে বিছানায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলাম চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। ফিরে এসে আর দেখতে পাইনি। এ দুঃখ চিরকাল আমায় কুরে কুরে খাবে আমি জানি। এখনও খাচ্ছে যেমন। মা-র যখন ক্যানসার ধরা পড়ল, আমি তখন কলেজে। বাবা মারা গিয়েছেন বছর দুয়েক হল। মা, আমি আর দাদা-বউদি একসঙ্গে থাকি। মায়ের ক্যানসার ধরা পড়ার পর সমস্ত চিকিৎসা দাদা করিয়েছেন, আমি শুধু পাশে ছিলাম। কিন্তু সব সময় মনে হত, মা-র জন্য আমারও তো কিছু করণীয় আছে। একটা হরলিক্স কিনে দিতে কিংবা হাতে করে একটু ফল এনে দিতে ইচ্ছে করত সম্পূর্ণ নিজের খরচে। কিন্তু আমি তখন অপারগ। দাদার কষ্টটাও বুঝতাম, যা দাদা-বউদি কোনও দিন বুঝতে দিতে চায়নি আমাদের। মা-র জন্য দাদার অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, বাড়তি অনেক টাকা দাদাকে বহন করতে হচ্ছিল মা-র ওষুধপত্রের জন্য। আমার বিবেকে লাগত। মনে হত, খুব শিগগিরি আমায় একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে, যাতে দাদার পাশে দাঁড়াতে পারি। সেই তাগিদেই আমি শিলিগুড়িতে একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম সেবার। মা-র শরীর তখন বেশ খারাপ। দাদারই এক বন্ধুর বাড়িতে থেকেছিলাম দু'দিনের জন্য। ইন্টারভিউ দিয়েই ফিরে আসব তুফানগঞ্জে। খুব ভালভাবে ইন্টারভিউ দিলাম, মা আর দাদা-বউদির আশীর্বাদ ছিল তো সঙ্গে। পরদিনই ফিরে আসার কথা। কিন্তু সে দিন রাতেই দাদা খবর দিল বন্ধুকে, আমাকে নিয়ে যেন রাতেই গাড়ি ভাড়া করে রওনা দেয়। ফিরে এসে মাকে না জানাতে পারলাম আমার ভাল ইন্টারভিউয়ের কথা, না জানাতে পারলাম আমার চাকরি পেয়ে যাওয়ার খবর। আজ শিলিগুড়িতে ভালভাবে চাকরি করছি আমি। মাস গেলে ভাল মাইনেও পাচ্ছি। মা-র জন্য কিছু করতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু দাদার পাশে আছি এখনও উপযুক্ত বোনের মতো— এটাই আমার আত্মতুষ্টি। চিরকাল এভাবেই থাকব আমি, দাদা আর বউদি বন্ধুর মতো পাশাপাশি— এটুকুই চাওয়া।

পাপিয়া ঘোষ, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার

টেক টক

অনলাইনে নিজের তথ্য সুরক্ষিত রাখুন

সাইবার অপরাধীদের দৌরাত্ম্যে নিশ্চিন্তে ওয়েব ব্রাউজিং-এর সুযোগ প্রায় নেই বলা যায়। সুরক্ষা না থাকলে অনলাইন থাকা আপনার তথ্যগুলি হাতিয়ে নেওয়া হ্যাকারদের পক্ষে কোনও ব্যাপারই নয়। শুধু তা-ই নয়, অনলাইন মার্কেটিয়াররাও আপনাকে ক্রমাগত বিরক্ত করে যাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। সুরক্ষিত থাকতে আপনাকে কিছু টুলসের সাহায্য তাই নিতেই হবে। সেইসব টুলসই এবারের আলোচনার বিষয়।

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট না করে পুরোপুরি ডিলিট করা উচিত। কারণ অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট করলেও ফেসবুকের সার্ভারে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য থেকে যায়। তবে সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে যে, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ওপেন করার সময় সেই ব্যক্তির কম্পিউটারে বা ফোনে ফেসবুকের তরফে গোপনে ট্র্যাকিং কুকিজ ইনস্টল করে দেওয়া যায়। পরবর্তীতে অ্যাকাউন্ট ডিলিট করলেও কুকিজের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির সার্ভিং বিহেভিয়ার এবং সার্ফিং হিস্ট্রি ফেসবুক কোম্পানি জানতে পারে।

ইন্টারনেটের দুনিয়ায় এমন অনেক কোম্পানি রয়েছে, যারা এভাবে ট্র্যাকিং কুকিজের মাধ্যমে আমাদের উপর গোপনে নজরদারি চালায়। যখন আমরা কোনও ওয়েবসাইট ভিজিট করি, তখন সেই সাইট থেকে ছোট ছোট ফাইল আমাদের কম্পিউটারে বা ফোনে ইনস্টলড হয়। এই ফাইলগুলিকে বলা হয় কুকিজ। ইন্টারনেটে আমরা কোন সাইট ভিজিট করছি, কী কী সার্চ করছি, সেই সব কিছুর উপর কুকিজ নজরদারি চালায়। কুকিজ অবশ্য আমাদের অনেক ক্ষেত্রে সাহায্যও করে। আমাদের সার্চ হিস্ট্রি, সার্ফিং বিহেভিয়ার কুকিজের জানা থাকায় ইন্টারনেটে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য দ্রুত সার্চ করতে কুকিজ আমাদের সাহায্য করে। তবে এটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, কুকিজের আসল কাজ আমাদের উপর নজরদারি চালানো। তাই নিয়মিত ব্যবধানে কুকিজ ডিভাইস থেকে ডিলিট করে দেওয়া উচিত। প্রতিটি ব্রাউজারে কুকিজ ডিলিট করার ইনবিল্ট ফিচার রয়েছে। এ ছাড়া একটি কার্যকরী অ্যাপ রয়েছে, যার নাম CCleaner। এই অ্যাপটির সাহায্যেও আপনি আপনার ডিভাইস থেকে কুকিজ-সহ বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ফাইল ডিলিট করতে পারবেন।

অনলাইনে নিজের প্রাইভেসি রক্ষার অন্যতম কার্যকরী উপায় হল VPN (Virtual Private Network)। VPN আপনার IP অ্যাড্রেস যেমন গোপন রাখবে, তেমনই অনলাইনে আপনি যে সমস্ত ডেটা এক্সচেঞ্জ করবেন, সেগুলিকেও এনক্রিপ্টেড করে সুরক্ষিত রাখবে। VPN ব্যবহার করলে আপনাকে অনলাইন ট্র্যাক করা কার্যত অসম্ভব। বিভিন্ন কোম্পানি VPN পরিষেবা দেয়, যেমন— Hotspot Shield, CyberGhost, HideMyAss, TorGuard ইত্যাদি। VPN পরিষেবা সাধারণত ফ্রি-তে পাওয়া যায় না। যে কোম্পানির পরিষেবা ব্যবহার করবেন, তাদের প্রতি মাসে ফি দিতে হবে।

প্রক্সি সার্ভার ব্যবহার করেও ইন্টারনেটে নিজের প্রাইভেসি সুরক্ষিত রাখা যায়। প্রক্সি সার্ভার হল আসলে একটি কম্পিউটার, যেটি ইন্টারনেট এবং আপনার কম্পিউটারের মাঝখানে একটি আড়াল হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে সরাসরি ইন্টারনেট অ্যাকসেস করছেন না, দ্বিতীয় একটি কম্পিউটার বা প্রক্সি সার্ভারের মাধ্যমে আপনি ইন্টারনেট অ্যাকসেস করছেন। আপনার কম্পিউটারের লোকেশন অর্থাৎ IP এবং প্রক্সি সার্ভারের IP সাধারণত আলাদা হয়। ধরুন আপনি শিলিগুড়িতে বসে নেট সার্ফ করছেন অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারের IP অ্যাড্রেস হল শিলিগুড়ি। কিন্তু আপনার প্রক্সি সার্ভারের IP অ্যাড্রেস হয়তো সিডনি বা ক্যালিফোর্নিয়া। সুতরাং কোনও কুকিজ যদি আপনাকে ট্র্যাক করতে চায়, তবে সে মনে করবে আপনি ক্যালিফোর্নিয়া বা সিডনিতে বসে নেট সার্ফ করছেন। ফলে আপনাকে ট্র্যাক করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। VPN পরিষেবার মতো প্রক্সি সার্ভার পরিষেবাও ফ্রি-তে পাওয়া যায় না। তবে আগ্রহীরা HideMyAss কোম্পানির ফ্রি প্রক্সি সার্ভার পরিষেবা ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

যে সমস্ত ওয়েবসাইটের URL-এর আগে HTTP বা HTTPS নেই, সেই সমস্ত ওয়েবসাইট কখনওই ভিজিট করবেন না বা সেইসব সাইটে নিজের কোনও গোপন তথ্য দেবেন না। কারণ এই সাইটগুলি মোটেই সুরক্ষিত নয়। এইসব সাইট ভিজিট করলে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য হ্যাক্ড হওয়ার তথা প্রাইভেসি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এ ছাড়া অনলাইন প্রাইভেসি সুরক্ষিত রাখতে আপনি ব্যবহার করতে পারেন Whonix অপারেটিং সিস্টেম। এই সিস্টেম অন্য OS-এর তুলনায় আপনার অনলাইন প্রাইভেসি এবং সুরক্ষাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। Whonix একটি ফ্রি অপারেটিং সিস্টেম। এটি ডাউনলোড করার লিঙ্ক হল— www.whonix.org।

ইন্দ্রনীল দত্ত

ছোট্ট বাগানে ফুল ফোটানো কঠিন নয়

কথায় বলে, 'শখের দাম লাখ টাকা'। হ্যাঁ, তবে আপনার ছোট্ট বাগান বাহারি ফুল দিয়ে সাজানোর জন্য লাখ টাকার দরকার নেই। মনের প্রশান্তির জন্য চাই একটুখানি উদ্যম আর সময়োপযোগী চারা নির্বাচন।

ডালিয়া— এই ফুল ভালবাসে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। এত বড় আকার আর এত বৈচিত্রময় রঙের সমাহার আপনার মনকে ভরিয়ে দেবে। টবে বা মাটিতে সহজেই আপনি ডালিয়া ফোটাতে পারবেন। দুর্গা পুজোর পরে অর্থাৎ নভেম্বর মাস থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রথমবার নার্সারি থেকে কাটিং চারা এনে লাগাতে হবে। পরের বছর থেকে নিজেই চারা করতে পারবেন। জানুয়ারি মাস থেকেই ফুল ফুটতে শুরু করবে। চলবে মার্চ মাস পর্যন্ত। এপ্রিল-মে মাসে চারা তুলে নেবেন।

মাটির নীচ থেকে ডালিয়ার আলু (টিউবার) তুলে ছায়ায় রাখতে হবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। নতুন চারা গজালে ধারালো ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কেটে কাটিং এড পাউডার লাগাতে হবে। তার আগে কপার অক্সিক্লোরাইডের (৫০ শতাংশ ডব্লিউপি) দ্রবণে ডুবিয়ে নিতে হবে। আর্দ্র বালিতে কাটিং চারাগুলো পুঁতে দিন। সপ্তাহখানেক পরে শিকড় এলে মূল জমিতে লাগাতে হবে।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

নেপালি, সাদরিতেও রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যায়

উত্তরবঙ্গ, বিশেষত তরাই-ডুয়ার্স রবীন্দ্রসংগীতচর্চার একটা উন্মুক্ত পরিবেশ। রবীন্দ্রগান এখানে পায় এক অন্য মাত্রা। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের গান ঘিরে প্রায় সবারই রয়েছে কমবেশি আগ্রহ। তবে এই বঙ্গে, বিশেষত ডুয়ার্স বহু জনজাতির বাসভূমি হওয়ায় এখানে রয়েছেন বহু ভাষাভাষী মানুষ। নিজস্ব ভাষার প্রতি আনুগত্য রেখেই ওইসব ভাষাভাষী মানুষ বহুদিনই বাংলা বলছেন। রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি অসীম আগ্রহ থাকায় সে গান গাইবারও চেষ্টা করছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত তাঁরা তাঁদের ভাষা অর্থাৎ নেপালি কিংবা সাদরি, এমনকি রাজবংশী ভাষাতেও তো গাইতে পারেন। কিন্তু কীভাবে? আলোকপাত করলেন ডুয়ার্সের রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী নীপা ঘোষ ভট্টাচার্য।

নীপারও জিজ্ঞাসা, যদি হিন্দি ভাষাতে অনূদিত হয়ে রবীন্দ্রসংগীত বহুল প্রচার পেয়ে থাকে, তবে নেপালি, সাদরি কিংবা রাজবংশী ভাষার ক্ষেত্রে হবে না কেন? ডুয়ার্সের অনেক কবি-সাহিত্যিক, যাঁদের নেপালি, সাদরি কিংবা রাজবংশী ভাষার উপর দখল রয়েছে, তাঁরা অনেকদিন আগেই ওইসব ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গান অনুবাদ করেছেন। তাঁদের অনূদিত নেপালি ও সাদরি ভাষার রবীন্দ্রগান তিনি নিজেই কয়েক বছর ধরে গেয়ে আসছেন। পাশাপাশি বেশ কিছু অনুষ্ঠানের জন্য তিনি আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিখিয়েও গাইয়েছেন। এই প্রজন্মের বহু আদিবাসী ছেলেমেয়ে তাদের নিজেদের ভাষাতেই রবীন্দ্রসংগীত শখে হলেও শিখতে আগ্রহী। তাদের জন্য নীপার প্রথম টিপ্‌স হল, শখ হলেও খেয়াল রাখতে হবে, গাইবার সময় তার কণ্ঠ, সুর ও তালে কতটা চলনসই। যদি ধরেও নেওয়া যায়, কণ্ঠ, সুর ও তালজ্ঞান রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষে নেহাত অনুপযুক্ত নয়, তা সত্ত্বেও তার গানের প্রাথমিক পাঠ নেওয়া দরকার। সেটা খুব কঠিন কাজ নয়। প্রাত্যহিক পড়াশোনা বা কাজের ফাঁকে সেই তালিম নেওয়া যায়। এর পর রবীন্দ্রসংগীত যে একটি গভীর মননের বিষয়, সে সম্পর্কে ধীরে ধীরে হলেও তার ধারণা তৈরি হওয়া দরকার। কয়েক বছর আগেও ছিল রবীন্দ্রগান নিয়ে নানা ধরনের বাধানিষেধ। আজ সেই বাধা নেই বলেই যেভাবে খুশি যেমন-তেমন কথা কিংবা সুরে গাওয়া যাবে, সেটাও কিন্তু নয়। আবার এটাও নয় যে, স্বরলিপি থেকে সামান্য একটু সরে গেল বলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে রবীন্দ্রনাথের গান ঠিক ঠিক বুঝে ভালবেসে গাইতে চাইলে তা নেপালি হোক কিংবা সাদরি ভাষা, সেটা অন্তরায় নয়। আসল কথা হল, সংগীতের প্রাথমিক পাঠ, তার সঙ্গে সুর-তাল ইত্যাদি বজায় রেখে গাওয়া। রবীন্দ্রগান গাইবার শখ তখনই যথাযথ হয়ে উঠবে, যখন এই সাধারণ জ্ঞানটুকু অর্জন করা যাবে। বাংলা ভাষা বলা কিংবা ভাব প্রকাশে আড়ষ্টতা রয়েছে অথচ নেপালি, সাদরি কিংবা রাজবংশীতে সড়গড়, তাকে কেন বাংলা ভাষাতেই রবীন্দ্রগান শিখতে হবে? গানের প্রাথমিক পাঠ অর্জন করেই সে স্বচ্ছন্দে তার রবীন্দ্রগান গাইবার ইচ্ছে পূরণ করতে পারে। চাইলে সে পেশাদার শিল্পীও হয়ে উঠতে পারে, তবে গান শেখার ব্যাপারে তাকে আরও একটু যত্নবান হতে হবে।

সৃজন বিশ্বাস

লাফা শাকের প্যালকা

রাজবংশী সমাজের বহুল প্রচলিত একটি রান্না এটি।

উপকরণ: লাফা শাক ১ আঁটি, সফ শাক আধ আঁটি, আদা ও রবাটা মিলিয়ে ১ বড় চামচ, লংকা ১টা, খাওয়ার সোডা আধ চামচ (আগেকার দিনের মহিলারা সোডার বদলে কলা গাছের মুড়ো আর ছাই ব্যবহার করত), নুন স্বাদমতো, জল ১ গ্লাস।

প্রণালী: কড়াইতে জল, নুন, সোডা দিয়ে ফোটান। ফুটলে শাকগুলো দিয়ে দিন। সঙ্গে আদা, রশুন, লংকা দিন। ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। সেদ্ধ হয়ে গেলেই গরম গরম ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্য রেডি।

মমতা বর্মণ, ফাঁসিদেওয়া

ডুয়ার্সের ডিশ

সরষে-পোস্ত ফুলকপি

উপকরণ: মাঝারি মাপের ফুলকপি ১টি, পোস্ত ও সরষে ৩ ঃ ১ অনুপাতে, বড় পেঁয়াজ ১টা, কাঁচা লংকা ৪-৫টা, আদা বাটা অল্প, কাজুবাদাম বাটা অল্প, নুন, চিনি।

প্রণালী: কড়াইতে তেল দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট করে কাটা ফুলকপির টুকরোগুলো একটু সাঁতলে নিয়ে পেঁয়াজ, আদা, লংকা বাটাসহ সরষে-পোস্ত বাটাও একবারে দিয়ে সামান্য কাঁচা সরষের তেল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাঁধুন। বারবার নাড়তে হবে, না হলে কড়াইতে লেগে যেতে পারে। খুব ভালভাবে কষাতে কষাতে মাখা মাখা হয়ে আসবে এবং কাঁচা গন্ধও থাকবে না। নুন ও মিষ্টি স্বাদমতো দিয়ে আর একটু হতে দিন এবং নামানোর আগে কাজুবাদাম বাটা দিয়ে দিন। সুস্বাদু এই সরষে-পোস্ত ফুলকপি রুটি, পরোটা কিংবা লুচির সঙ্গে দারুণ মানানসই।

মৌমন ব্যানার্জি, জলপাইগুড়ি

ইনসমনিয়ায় ওষুধের সঙ্গে কাউন্সেলিংও দরকার

ঘুম নিয়ে কমবেশি সমস্যা আছে প্রায় সবারই। কিন্তু রাতের পর রাত চোখে ঘুম না থাকলে সমস্ত কাজকর্মই তো ভেস্তে যেতে বাধ্য। তাই ঘুমের দেশে যেতে চান সবাই। কিন্তু ঘুম যদি না আসে? তাহলে! দু'চোখ জুড়ে ঘুম আসার উপায় কী? জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞ।

ঘুমের সমস্যা এক-দু'দিন তো হতেই পারে। কিন্তু নিয়মিত সেই সমস্যার কবলে পড়লে সেটা মোটেও সুস্থতার লক্ষণ নয়। এটাই কি অনিদ্রা বা ইনসমনিয়া? চিকিৎসাশাস্ত্র মতে জন্মের পর নবজাতক সাধারণত ২০-২২ ঘণ্টা ঘুমায়। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন স্বাভাবিক ঘুমের সময় ৭-৮ ঘণ্টা। গুণগত বিচারে ঘুমকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করি— ১) অক্ষিগোলকের দ্রুত কম্পনযুক্ত ঘুম, যেখানে ঘুমের সময়ে আইবল দ্রুত নড়াচড়া করে। ২) মৃদু কম্পনযুক্ত ঘুম, যেখানে আইবলের নড়াচড়া কম হয়।

ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা আসলে কী?

শারীরিক পরিশ্রম, অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করতে ঘুম খুবই জরুরি। ঘুম মানুষের শরীরের যাবতীয় জৈব ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, বিশ্রাম দেয় মস্তিষ্কের কোষগুলিকে। কিন্তু ঘুমের সময় যখনই ব্যাঘাত ঘটে, তখনই শরীর ও মনে নানান সমস্যা দেখা দেয়। পরপর কয়েকদিন ঘুম না আসাটাও কিন্তু কোনও অসুস্থতার লক্ষণ নয়। কিন্তু এই অবস্থাই যদি আরও বেশি লম্বা হয়ে পড়ে, অর্থাৎ পরপর তিন বা চার সপ্তাহ ঘুমের দেখা নেই, তখন তাকে অনিদ্রা বা ইনসমনিয়া বলা হয়ে থাকে।

ইনসমনিয়া কত রকমের

দীর্ঘদিন ধরে অনিদ্রাকে আমরা ইনসমনিয়া বলি বটে, কিন্তু তারও নানা রকম আছে। যেমন রাতে শোবার সময় বিছানায় অনেকক্ষণ জেগে থাকা, একে আমরা বলি স্লিপ অনসেট ইনসমনিয়া। অনেকের আবার ২-৩ ঘণ্টা টানা ঘুমের পর আর ঘুম আসতেই চায় না। একে আমরা বলি স্লিপ মেনটেন্যান্স ইনসমনিয়া। আবার মাঝরাতের পর থেকে জেগে থাকাকে বলি স্লিপ অফসেট ইনসমনিয়া। কারও কারও সারারাত গভীর ঘুম হয় না, কিন্তু একটা ঘুম ঘুম ভাব থেকে যায়, মানে একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে রাত কাটে। একে বলি নন রেসপোরেটিভ স্লিপ। কখনও কখনও কোনও বিপদ বা অপারেশনের পর ২-৩ সপ্তাহ ধরে ঘুমের সমস্যা ঘটে। একে বলি শর্ট টার্ম ইনসমনিয়া। মাসের পর মাস বা বছরভর যদি কারও অনিদ্রার প্রকোপ চলে, তবে শরীরে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়, স্বাস্থ্যহানিও ঘটে। একেই বলে ক্রনিক বা লং টাইম ইনসমনিয়া।

ইনসমনিয়ার চিকিৎসা

অনিদ্রার কারণে অনেকেই বাজার চলতি ওষুধ কিনে খান। কিন্তু সমস্যা হল, ওই ওষুধ বন্ধ হলে স্বাভাবিক ঘুম আর হয় না। ইনসমনিয়া আক্রান্ত রোগীদের শরীর এবং রোগের প্রকৃতি বুঝেই তার চিকিৎসা করতে হয়।
এক-একজনের ক্ষেত্রে এক-এক রকমের থেরাপির প্রয়োজন হয়। যেমন মানসিক উদ্বেগ বা উত্তেজনা থেকে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে রোগীর ব্যক্তিগত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, এমনকি রোগীর ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকে তাঁর অসুবিধার কথা জেনে-বুঝে চিকিৎসা করা হয়। আবার স্লিপ ওয়াকিং বা ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যেস যাদের, তাদের অবচেতন মনে নানা ভয় থাকে। তখন রোগীর কাছ থেকে আসল কারণ খুঁজে বার করতে হয়। তবেই তার চিকিৎসা হয়। কারও মদ্যপানের অভ্যেস থাকলে সেটা যদি শারীরিক বা অন্য অসুখের কারণে বন্ধ করতে হয়, তখন ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। এ ক্ষেত্রে ওষুধ এবং কাউন্সেলিং— দুটোরই দরকার পড়ে। প্রস্টেট অপারেশন বেশি বয়সে সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে ওষুধ দিয়ে প্রস্টেটের সাইজ কমিয়ে দিলে স্বাভাবিক ঘুম হয়। আর অপারেশন করতে পারলে তো অনিদ্রার সমস্যা সহজেই মেটে। আসল কথা হল, শারীরিক অসুস্থতার জন্য যে অনিদ্রা, তা শরীরের উপসর্গ দূর করলে মিটে যায়। আর মানসিক উদ্বেগের কারণে অনিদ্রায় ওষুধের সঙ্গে কাউন্সেলিং-এর দরকার পড়ে।

স্বাভাবিক ঘুমের জন্য

ঘুমের একটা সাইকেল মেনটেন করুন। অর্থাৎ প্রতিদিন একই সময় বিছানায় যান এবং উঠুন। রাত জেগে টিভি দেখবেন না। রাতের মেনুতে সহজপাচ্য খাবার রাখুন। শোবার আগে ধূমপান, মদ্যপান বা কোনও নেশার দ্রব্য কোনওভাবেই নয়। শারীরিক অসুস্থতা থাকলে তার চিকিৎসা করান। মানসিক সমস্যা ঘটলে কাউন্সেলিং করান। দিবানিদ্রা ত্যাগ করুন। সন্ধের পর চা-কফি, কোলা জাতীয় পানীয় বন্ধ করুন। পরিচ্ছন্ন বিছানা, হালকা রঙের দেওয়াল ও নরম আলোয় ঘুম ভাল হয়। শোবার আগে মনকে যতটা সম্ভব দুশ্চিন্তামুক্ত করুন। হালকা গান শুনতে পারেন বা হালকা কোনও বই পড়ে দিনের শেষে ঘুমের দেশে চলে যাওয়া যায়।

ডা. চঞ্চল জানা

শ্রীমতীদের নিয়ে ভাবনা কি শুধু শ্রীমতীরাই ভাববে?

পৌনে ন'টা বেজে গেল। হাতে আর মাত্র ৪৫ মিনিট। কোনওরকমে সংসারের কাজকর্ম সেরে নিজেকে গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে আমার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে। লাটাগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুধু ছাত্রী আর সহকর্মীদের চিন্তায় মন ডুবে থাকে। ছুটির পর ফিরতে ফিরতে আবার বাড়ির চিন্তা। আমার মতো যাঁরা কর্মস্থল আর সংসার ছাড়াও আরও নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের দম ফেলবার ফুরসত কোথায়। সাংসারিক দায়বদ্ধতা সঠিকভাবে পালিত না হলে একদিকে যেমন ঘরোয়া অশান্তি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অন্য দিকে সেই কারণে মানসিক বিশৃঙ্খলাও তৈরি হয়। ফলস্বরূপ সমস্ত কাজেই তার প্রভাব পড়ে। তাই প্রতিটি মহিলাই চাইবেন তাঁর সংসারকে গুছিয়ে ঠিকঠাক রাখতে।

এখানে বলার বিষয় একটাই, এই ভাবনাটা উভয় পক্ষেরই ভাবা উচিত। যে সংসারে স্বামী-স্ত্রী সমস্তটাই ভাগাভাগি করে নিতে জানেন, তাঁরা সুকৌশলে ঝামেলা-অশান্তি এড়িয়ে একটা শান্তি-নীড় তৈরি করে নিতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হয় তখন, যখন কর্ত্রীটির উপর আশি শতাংশ কাজের বোঝা চেপে বসে এবং কর্তা মানুষটি তার কুড়ি শতাংশ সামলাতেই হিমশিম খেয়ে যান। এইসব ক্ষেত্রে দশভুজা গৃহকর্ত্রীটির সহনশীলতা ও ধৈর্য নিয়ে প্রশ্ন তোলাই উচিত নয়।

সাংসারে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েও সারাজীবন উপেক্ষিত আর অনাদৃতই থেকে গিয়েছেন এমন নারীর সংখ্যা হাতে গুনে শেষ করা যাবে না। যেমন আমার মাকে দেখেছি, আজও দেখছি— প্রশংসা পাওয়ার জন্য মাথা না ঘামিয়ে তাঁর নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য কীভাবে পালন করে গিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, জানতেন বিপদ বা কঠিন সময়ে বিচলিত না হয়ে কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়। আমি মায়ের কাছ থেকেই শিখেছি, কীভাবে সংগ্রাম করে জীবনের সুচিন্তিত গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব। সেদিক থেকে আমি আমার মায়ের জন্য গর্বিত।

আর-একজনের কথাও বলব, আমার বাড়ির পরিচারিকা। আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ির দায়দায়িত্ব আমার মায়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন তিনি। আমার বাড়িটি যেহেতু তাঁর কর্মস্থল, তাই তাঁকেও আমারই মতো নিজের সংসারের সবটুকু সেরে কাজের জায়গাতেও কর্তব্যটুকু বুঝিয়ে দিতে হয়। অথচ এঁরা আড়ালেই থেকে যান। শ্রীমতীদের নিয়ে ভাবনা কি শুধু শ্রীমতীরাই ভাববে? এর উত্তর আমার জানা নেই।

চা-বাগিচায়, কলকারখানায়, হাটেবাজারে সর্বত্র নারীরা তাঁদের কঠোর শ্রম দিয়ে সমাজের রথচক্র এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বহু গৃহবধূ আছেন, যাঁরা তাঁদের সংসারকে উপেক্ষা না করেও নিজেদের প্রতিভাকে অনেক লড়াই করে মেলে ধরেছেন, এগিয়ে এসেছেন নানান সৃজনমূলক কাজে। আজ তাঁরা অনেকেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পিছনে আছে তাঁদের কঠোর অধ্যবসায়। এই নিরলস অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নারীরা যদি আরও বেশি বেশি করে এগিয়ে আসেন তাহলে সমাজ সঠিক দিশায় পৌঁছাবে বলেই আশা করা যায়।

অর্চিতা সিহি, লাটাগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

তক্কাতক্কি

প্রেমে শরীর ও মনের সহাবস্থান ঘটবেই

'প্রেম কি শুধুই শরীরসর্বস্ব একটি খেলা, নাকি মনের বীণার তারেই বাজে প্রেমের প্রথম ঝংকার?' মতামত জানিয়েছেন অনেকেই। তার মধ্যে একটি আমরা প্রকাশ করেছি গতবারের সংখ্যায়। এবার আরও একটি প্রকাশ করা হল।

প্রেমে কখনও শরীর আর মনকে আলাদা করা যায় কি? মনে হয় যায় না। প্রেম শুধুই শরীরী খেলা না হলেও শরীরকে বাদ দিয়ে প্রেমের কোনও অস্তিত্বই নেই। শুধু মন থেকে ভালবাসলাম, আর প্রেম হয়ে গেল, তা হয় না কখনও। বিষয়টিকে দু'রকমভাবে ভাবা যেতে পারে— ১) কেউ কারও প্রেমে পড়ল মানেই তার শরীরে বেজে উঠল 'ঝংকার'। অর্থাৎ সে অপরকে (সঙ্গী বা সঙ্গিনী) তার শরীর দিয়ে উপভোগ করতে চাইল।

২) হঠাৎই ঘটনাচক্রে কোনও এক পুরুষের সঙ্গে কোনও এক নারীর দুম করে কোনও রোমান্টিক মুহূর্তে শরীরী সম্পর্ক ঘটে গেল, অবশ্যই উভয়ের নিজ নিজ ইচ্ছায়। কিন্তু তারপরই দেখা গেল তা গড়িয়ে গেল গভীর প্রেমে।

দু'টির কোনওটিকেই উপেক্ষা করার কোনও জায়গা নেই। তবে হ্যাঁ, মন দিয়ে ভালবাসা আর শুধুই একটু শারীরিক খিদে মেটানোর পন্থা হিসেবে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়া— দু'টিকে কখনও এক করা ঠিক নয়। মূল কথা, প্রেম হলে তাতে শরীর ও মনের সহাবস্থান ঘটবেই। একে অপরের পরিপূরক।

শুভ্রজিৎ দাস, হলদিবাড়ি, কোচবিহার

মনের ভিতর এমন অনেক কথা জমে উঠছে যা কারুর সঙ্গে শেয়ার করলে হালকা লাগবে। জানান আমাদের। প্রয়োজনে নাম ও ঠিকানা গোপন রাখা হবে। লেখাটি যেন ২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা— **'মেঘপিয়োন', 'শ্রীমতী ডুয়ার্স বিভাগ', প্রযত্নে- 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তাভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১ অথবা ই-মেল করুন— srimati.dooars@gmail.com**

আপনিও হতে পারেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিবেদক। আপনার এলাকায় কোনও উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা হলে তাই নিয়ে প্রতিবেদন লিখে পাঠাতে পারেন। প্রতিবেদনটি যেন ২৫০ শব্দের মধ্যে হয়। সঙ্গে ছবি দিতে ভুলবেন না। লেখা পাঠান এই ঠিকানায়— **'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১। ই-মেল- srimati.dooars@ gmail.com**

ফেব্রুয়ারি মাসের বিষয়—
'কোনও কোনও পুরুষকে ঘৃণ্য ধর্ষণে লিপ্ত করতে মেয়েদের ছোট পোশাক কতখানি দায়ী?' আপনার মতামত জানান। মতামত হতে হবে অনধিক ২০০ শব্দে। মনোনীত মতামত প্রকাশিত হবে আমাদের মার্চ সংখ্যায়। লেখা পাঠানোর ঠিকানা— **'তক্কাতক্কি', 'শ্রীমতী ডুয়ার্স বিভাগ', প্রযত্নে- 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তাভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১ অথবা ই-মেল করুন— srimati.dooars@gmail.com**

অন লাইনে প্রাপ্তিস্থান www.boimela.in

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় রংরুটের বই। পাওয়া যাবে 'এখন ডুয়ার্স' স্টলে। ১১-২০ মার্চ

মূল্য ১৫০ টাকা

মূল্য ১৫০ টাকা

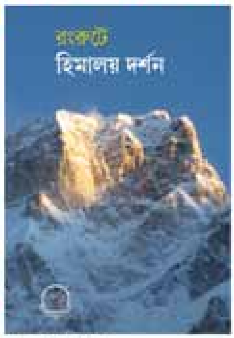

মূল্য ২০০ টাকা

মূল্য ১০০ টাকা

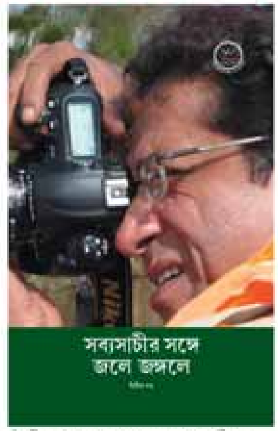

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

পশ্চিমবাংলার ৩৬০ প্রজাতির পাখির সচিত্র বিবরণ। হার্ডবোর্ড বাঁধাই। ৫০০ পৃষ্ঠা। আগাগোড়া রঙিন। বিদেশি আর্ট পেপারে ছাপা। মূল্য ১০০০ টাকা।

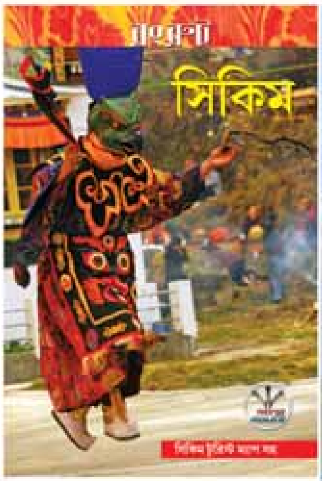

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। হার্ডবোর্ড বাঁধাই। মূল্য ২০০ টাকা

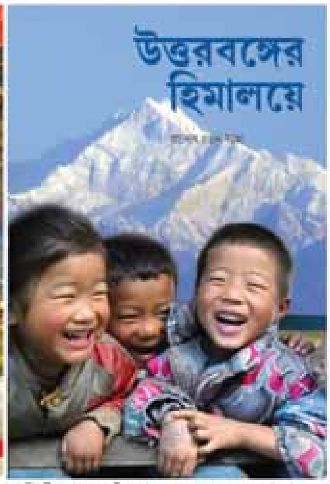

দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

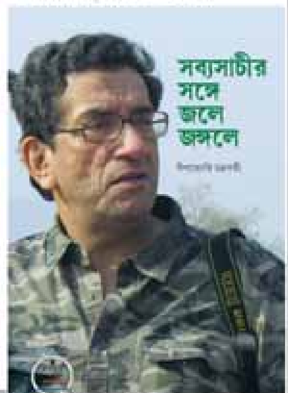

সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

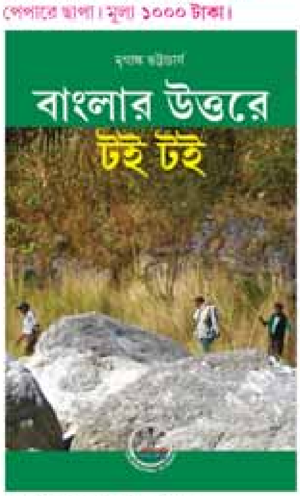

ডুয়ার্স পর্যটন বৃত্তান্তে রয়েছে অভিনবত্বের ছোঁয়া
মূল্য ২০০ টাকা।

আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়ার আগে এই বই প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ১৫০ টাকা

মূল্য ৯০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান অক্সফোর্ড ১৫ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ১৬, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, স্টারমার্ক-এর সবকটি শোরুমে, বোলপুর শান্তিনিকেতন সুবর্ণরেখা, শিলিগুড়ি ইকনমি বুক স্টল কলেজ রোড, জলপাইগুড়ি ভবদার দোকান, কমার্স কলেজের উলটো দিকে কোচবিহার অ্যালফাবেট স্টুডেন্ট হেলথ হোমের উলটো দিকে, আলিপুরদুয়ার ম্যাগাজিন সেন্টার কলেজ হল্ট, আলিপুরদুয়ার কোর্ট।

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.